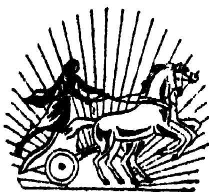
এই শহরে

বেদুইন

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং হাউস

২০, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—১



প্রথম প্রকাশ :

১৬ই আগষ্ট, ১৯৬০

প্রকাশক :

শ্রীবাসুদেব লাহিড়ী

ইষ্টলাইট বুক হাউস

২০, ষ্ট্রাণ্ড রোড

কলিকাতা—১

মুদ্রক :

শ্রীনারায়ণ লাহিড়ী

লয়াল আর্ট প্রেস প্রাইভেট লিঃ

১৬৪, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১৩

প্রচ্ছদ :

শ্রীসত্যসেবক মুখোপাধ্যায়

মূল্য দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

বাইশ বছর ধরে এই শহরের রূপান্তর দেখেছি আরও লক্ষ জনের মত। শহরের রূপ বদলেছে, মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী বদলেছে এবং আমার দেখবার ভঙ্গীও বদলেছে। তাই যা দেখেছি, দেখছি, শুনেছি, শুনছি তাই লিখে দিলাম আমার বাইশ বছরের সাথী — সহধর্ম্মিণী উমারাণীকে।

এই লেখকের বই :

পথে প্রান্তরে—১ম পর্ব

পথে প্রান্তরে—২য় পর্ব

যশাইতলার ঘাট

কোন এক রাতে

তিস্তার চরে

কবি কঙ্ক (রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)

রুপোতি

এই শহরে

ঃ এক ঃ

বাদশাহ শাহ আলম, দিল্লিসে পালম।

সতরশত ষাট গজের মাপে দশ মাইল এ-রাজ্যের চৌহদ্দি। বাদশাহী চারপাইয়ার তক্তে বসে গোঁফে আতর মাখিয়ে ঘৃতভোজী পূর্বপুরুষদের স্মরণ করছে নয়া বাদশাহ তেল চট্‌চটে নিজস্ব হাতের তেলো শুঁকে। অনেককাল আগেই ময়ূর-সিংহাসনের ময়ূর উড়ে গেছে, বেচারা সিংহবাবাজী মা-দুর্গার পায়ের তলায় মাটির পোষাক গায়ে দিয়ে হাঁই তুলছে। আর আসন? চারপাইয়া আসনের এক পা ভেঙ্গে নাগরদোলার খেল দেখাচ্ছে। শাহ আলম আফিম খায়, ইংরেজ দাদনি টাকা দেয়, টাকার মাশুল গোনে দেশের লোক, বাদশাহ বাঁদির কোলে মাথা রেখে ঘুমোয়, দেশের লোক ঘুমোয় কবরখানায়। বাদশাহী ফৌজের তলোয়ার ভেঙ্গে হাজামের হাজামতীর খুর তৈরী হয় দিল্লীর কামারশালায়।

ইংরেজী বাদশাহীর খুঁটি বসিয়েছে ক্লাইভ।

জালিয়াতির জোরে রাজ্য পেল ইংরেজ, জালিয়াতির দায়ে ফাঁসি হল নন্দকুমারের। উমিচাঁদ মুর্শিদাবাদের রাস্তায় জিগীর দেয়, ক্লাইভ চোখ রাঙায় বাদশাহকে। যে হাত কুর্নিশ করেছে, সেই হাত উঠেছে স্কন্ধে। এখন দায় কার আর দায়িত্ব কার, তার হিসাব মেটায়নি কেউ। নতুন বাদশাহীর পত্তন হয়েছে গঙ্গার তীরে।

সালটা হল সতরশত বার।

আলমগীর বাদশাহ চোখ বুঁজেছে। তক্তে বসেছে শাহ আলম, তখনও দিল্লিসে পালমের ইতিহাস তৈরী হয় নি। তখন দিল্লি বহত দূর অস্ত। ইংরেজদের মুখপাত্র রাসেল সাহেব বাদশাহের পদধূলি হাতে তুলে কপালে ঠেকিয়ে জিব দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করল। প্রার্থনা, বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবার অধিকার। কোথায়?—বাংলা, বিহার আর উড়িষ্যায়।

তারপর পঞ্চাশ বছরও পেরোয়নি।

শাহ আলম নাম্বার টু তখন পালাম অবধি রাজত্ব করেন, তিনি দিলেন ফরমান। যাকে বলে ' গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল,' ক্লাইভ মোড়লের মোড়লীকে চাঁদির জুতোর ঠক্কর দিল। রাসেল তখন ক্রুশ বুকে নিয়ে শুয়ে পড়েছে, নইলে একরাত সুনিদ্রা হত। পয়জারের ক্লেদ তখন তার জিহ্বায়, দংশন করবার রাস্তা নেই।

সবার অজান্তে ইংরেজের বুনিয়াদ পোক্ত হল। জানল শুধু ভগবান। মূক স্রষ্টা ইঙ্গিতেও এ সুসংবাদ জানতে দিল না কাউকেও।

তারও আগে।

ষোলশত আশী সাল।

ইংরেজের জাহাজ এসে দাঁড়াল আজকের বাবুঘাটে। মিষ্টি জলের অভাব। পানীয় সংগ্রহে নামল ইংরেজ। পর্তুগীজ আর মগের অত্যাচারে নদীর কিনারায় গ্রাম ফৌত হয়ে গেছে। ধবল বরণ দেখলে লোক ছুটে পালায়।

চার্নকের শুকনো গলায় জল দেবার লোক নেই। তবুও তারা নামল।

ধবল বরণের দোষ ত্রুটি কার না ছিল! পর্তুগীজ মগদের হার মানিয়ে ইংরেজ লুট করল হুগলী, লুট করল বালেশ্বর। এক হাতে খোলা তলোয়ার আরেক হাতে বন্দুক নিয়ে চার্নক ঘুরছে লুটের বখরা নিতে।

সরকারে সংবাদ গেল।

বাদশাহী ফৌজ এল এগিয়ে। তল্পিতল্লা গুটিয়ে চার্নক দিল চোঁচা দৌড়, রেখে গেল হিথকে। বখরা পাবার যখন অসুবিধা নেই তখন জানটা দিয়ে লাভটা কি!

দেড়লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়ে চার্নক আবার এল চার বছর পর। ষোলশত নব্বই সালে বরিষার সাবর্ণ চৌধুরীরা চার্নককে বসবার ঠাঁই দিল। ঠাঁই পেয়েই শোবার ব্যবস্থা করল। অনেকদিনতো দেশ ছাড়া। লুটের টাকার অভাব কোথায়! প্রাণটা শুধু আই ঢাই করে। শয্যাটা তার কণ্টক।

পায়ে হেঁটে খবর এনে পৌঁছাল মুন্সী কেরামত। এক জাহাজ বিবি আসছে বাংলার মাটিতে। কর্মচারীদের খেদমত করতে লণ্ডনের নোংরা পল্লী থেকে কোম্পানী পাঠিয়েছে Blue blood.

চার্নক বসল অঙ্ক কসতে। ওয়ান ইজ টু টোয়ানটি সেভেন। ইম্প্যসিবল? খানসামা লতিফ মিঞাকে ডেকে বলল, তুমারা বিবি হ্যায়।

লতিফ মিঞা সাহেবের পা ধোয়াচ্ছিল মাটির গামলায় জল নিয়ে। সায়েবের কথা শুনে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।

কাহে রোতা ?

হুজুর সাহেব, ফেরিঙ্গিরা বিবি চুরি করে নে-গেছে।

দুসরা বিবি মাঙ্গাও।

লতিফ মিঞা জানে না, বিলেত থেকে সায়েবরা বিবি মাঙ্গিয়ে আনে, জানলে ইনডেণ্ট করত নিশ্চয়ই।

বিবিরা এসেছে।

গাদা বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করে অভ্যর্থনা জানায় কুঠিয়াল। সেদিন সরাবখানার চৌব্বাচায় তলানি পড়েছে।

তিনমাস জাহাজে ভেসে গাল' চুপসে গেছে অনেকেরই, বয়সটাও সবার জুত-সই নয়। এত কাণ্ডিডেটের এত কম বিবি। তবুও যে পারল ঠোঁটে ঠোঁট ছুইয়ে নিল। চাতকের জলপান। পিপাসা নিবৃত্তি নয়।

হিথ বলল, একটা বেছে নাও চার্নক।

না।

কেন।

অচল বেসাতি।

ইয়েট ব্লু ব্লাড।

তার চেয়ে নেটিভ বেশি ভাল, বেশি ফেথফুল।

মনের দুঃখে চার্নক বেরল গঙ্গার কিনারায় সয়ের করতে। সয়ের করা তার অভ্যাস। আজও বেরিয়েছে। শুনতে পেল কাড়ানাকাড়ার শব্দ, আর জোর হট্টগোল।

পাল্কী বরদারকে পাঠাল কুঠিতে। বসে রইল গাছের তলায়। হাতিয়ার বেঁধে তারা হাজির হতেই চার্নক চলল এগিয়ে।

দূরে, খুব দূরে নয়। আনন্দমুখর কলরব।

অশনিপাতের মত ধবলের আবির্ভাব। আনন্দে ভাটা পড়ল। চার্নক তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে লাফিয়ে পড়ল জনতার মাঝে। নিমিষে জনশূন্য হল নদীর কিনারা। রইল শুধু তিনজন।

একটি মৃতদেহ।

অপরটি ?

তারই কথা বলছি।

বামুনের মেয়ে আগুনে ঝাঁপ দেবে। কাড়া-নাকাড়া বাজায় ভাড়াটিয়া বাদ্যকর, বামুন পুরুত হাততালি দেয় ধর্মের নামে মানুষ পুড়িয়ে টোস্ট করবার আশায়। গঙ্গার তীরে মেলা বসেছে, বামুনকন্যার বয়সের হিসাব করেনি কেউ, বয়সের ধর্মও মানেনি কেউ। সতীর পতি মরেছে, হাতে পায়ে দড়ির প্যাঁচ কসে সশরীরে স্বর্গে পৌঁছে দেবার দায় রয়েছে অনেকেরই, তামাসা দেখবার লোকের অভাব নেই, অবশ্য আহা বলবার লোকের অভাব ঘটেছে। তাজা মানুষের দুঃখে বুক ফাটে না কারুরই, মরা মানুষকে স্বর্গে না পৌঁছে বুকের ব্যথা কমাতে চায় না কেউ-ই।

বেনের বংশধর চার্নক। নতুন সওদা করল গঙ্গার তীরে। বামুনকন্যা আগুনের ছোঁয়া পাবার আগেই যবনের ছোঁয়া পেল। ইংরেজ নন্দনের শুকনো বুকে ভালবাসার বন্যা নামল বামুনের মেয়েকে পেয়ে। পত্তন হল কোলকাতার। বৈঠকখানার ফুরসি হুঁকোয় জল বদলে দিতে থাকে হুঁকা-বরদার। ভাল করে আড্ডা বসল কোলকাতার প্রথম ময়দানে, বৈঠকখানার বটগাছতলায়। কোলকাতার মানুষ সেদিনও ভাবেনি, চার্নকি ভোজবাজির খেল্ খেলতে মাথার কাঁচা চুলের গোছা অসময়ে সাদা হয়ে উঠবে।

কান পেতে যদি কেউ শুনতো দেশী মেমের সাথে বিদেশী সাহেবের নিত্যকার্য, ঘরকন্নার কথা তাহলে শান্তি না পেলেও সুখ পেত। দিব্যি করে বলবার সাহস যদি থাকে, তাহলে বুকে হাত দিয়ে বলতে হবে, ঠোলাকাটা বামুনের বউ চার্নক সাহেবের ঘরে সুখেই রয়েছে খুশী মনে।

রইবে বই কি। স্বর্গের রাস্তা যারা খুলে দিয়েছিল তারাই নরকের রাস্তা পরিস্কার করে দিয়েছে। ঘুঁটে কুড়ুনী রাজরাণি হয়েছে, দেশের লোক কপাল না চাপড়ে ঘোঁট বেঁধেছে। সংবাদটা মুর্শিদাবাদের তক্তে কেউ পৌঁছে দেয়নি। দিলেও জুরীর বিচার না হয়ে কাজির বিচার হত। হিন্দুর মেয়ে কেরেস্তানের ঘর ছেড়ে মোগলের বাগানে প্রজাপতির মত পাখা মেলে উড়ে বেড়াত।

চার্নকের ঘুলঘুলি দিয়ে চুপি চুপি তাকিয়ে দেখ, দেখবে দিশি মেমকে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে সাহেব বলছে, তুমকো বহুত ভালবাসতা হ্যায়।

তারপর ?

তারপর আর কিছু থাকতে পারে ? —গাল রাঙা, ঠোঁট রাঙা, চুক্ করে একটা আওয়াজ। এবার চোখ বুজে থাকো। পিরিলি বামুন সত্য সত্যই কি অত ভালবাসত তাকে ? হয়ত বা ভালবাসত, কিন্তু তার বাহ্যিক কোন নিদর্শন ছিল কি ! হয়ত ঘর নিকোচ্ছে সে, ডাকল তাকে, ওগো শুনছ ? ঘোমটা ভাল করে মাথায় টেনে দিয়ে মাথা নীচু করে আবার ঘর নিকোতে হত, মনের কোনে অনেক কথা থাকলেও, মুখে বলতে পারত না। তার চেয়ে যবন ভাল। বামনীর মনুষ্য জন্মটা ধন্য হল। জাত দিল পেটও ভরল।

তারপর ?

তারপর সব ইতিহাস। বই খুলে পড়, সব পাবে। টানা পাখার তলায় চার্নকের কোলে মাথা রেখে বিবি আরামে ঘুমোচ্ছে। দৃশ্যটা অনুভব কর, দেখতে পাবে না কোন দিনই।

কোলকাতার দেড়শ ঘর, তার সাড়ে সাত শত মানুষ ইংরেজের স্তুতি করছে। কোন সালে ? —বোধ হয় সতরশত পঞ্চাশ সবে পেরিয়েছে। ঠিক দুশো দশ বছর আগে।

ততদিন চার্নক ফতে হয়েছে। বৈঠকখানায় আর সেই বৈঠক বসে না। সে বটগাছের শেকড় পর্যন্ত খুঁজে পাবে না। না-ই বা থাকল ; বৈঠকখানায় বৈঠক আজও বসে। নামের মাহাত্ম্য রয়েছে। নতুনকালের বৈঠকে জমায়েত হয় চোরাকারবারের ফড়িয়া দালাল। ফুরসী হুকোয় তামাক খাবার লোক নেই, বিড়ির খোলে গাঁজা ভর্তি করে সুখটান দেয় নতুন বৈঠকী মানুষরা। চার্নকের ফুরসী না কি মিউজিয়ামের শোভা বৃদ্ধি করছে। লোকে বলে, চোখে দেখেনি।

চার্নকের ঐতিহ্য নষ্ট হয় নি, তার বংশধররা আজও দিব্যি গা-গতরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, গায়ের রংটা ধীরে ধীরে তামাটে হয়ে আসছে।

টেঁসো পাড়ায় ডাল চচ্চড়ি খেয়ে খেয়ে ধীরে ধীরে "হোমের" কথা তারা ভুলে চলেছে। দু'শো বছরের ওপর তাদের রাজ্য কায়েম রয়েছে ঐ পাড়ায়। গায়ের রঙ্ মিইয়ে আসছে কতকটা রোদে কতকটা মিশ্রনে।

মিশ্রনের বড় গুণ। গুণবানের দল মাঝে মাঝে আদালতে এসে দাঁড়ায় সাইকেল চুরি আর রাহাজানির দায়ে। হয়ত বা নারী ধর্ষণের দায়েও আসে, বেশি দূর সে মামলা এগোয় না, মাঝ পথে মিটিয়ে নেয়। চার্নক বেঁচে থাকলে, 'ইওর অনার, মাই সন্স্' বলে গদগদভাবে জামিন পত্রে সহি দিত। সাক্ষী জোগাড় করে নির্দ্দোষ প্রমাণ করতেও কসুর করত না। অভিজাত যারা তাদের কথা বলছি না।

টেঁসো পাড়ার রকে রকফেলোর দল জুয়ায় বসে, মদের চোরা কারবার চালায়। মাঝে মাঝে পুলিশ এলে হন্তদন্ত হয়ে ছুট দেয়। ইংরেজের জমিদারী কায়েম করে গেছে যারা তাদের পূর্বপুরুষ চার্নক অথচ নিজের বংশধরদের ভবিষ্যত গড়ে কেন যে রেখে যায় নি, সে কথা কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু এক সময় ওরাই ছিল আভিজাত্যের ছায়া। কায়া ছিল সাক্ষাত ইংরেজ, আর পেছন পেছন ছুটত ছায়ার দল। মেয়ে হয়ে জন্মালে কনভেণ্টে পড়তে যেত! নাম ধাম লিখতে শিখলেই সওদাগরী অফিসে মোটা মাইনের চেয়ার জুটত। কাজ তাদের কম, অকাজটা বোধ হয় ছিল বেশি। বুকের পরিমাপ স্থায়িত্ব লাভ করলে চেয়ারে বসবার সময় দীর্ঘ হত; ঠোঁট আর গালের রঙ জুতসই হলে বছর শেষে বেতন বৃদ্ধি পেত। ইয়ার এণ্ডিং-এ ম্যাটারনিটি থেকে ফিরে এলেও পিতৃদেবেরা বংশধরদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করে যেত ভুল করত না।

আর যারা ব্যালান্স রাখতে পারত না তাদের ফিরে আসতে হত সারমেয় শ্রেণীর মত একপাল সন্তান আর রোগ নিয়ে। আইনের পতি বে-আইনের

পতিদের সৃষ্ট সন্তানদের নিয়ে হাঁপিয়ে উঠত। মনে মনে কামনা করত, তার মেয়েরা যেদিন যুবতী হবে সেদিন তার দুঃখ ঘুচবে। মেয়েরা তাদের সম্পদ তার দেহের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে করতে মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। কনভেণ্ট ছেড়ে সওদাগরি অফিসের সিঁড়িতে পা দিলে মেরীমাতার নামে কেক-পুডিং উজাড় করত, দেশী মদের আড্ডা জমাত। পাড়ার ফচকে ছোকরা একটা না হলে নয়, বে-আইনকে আইনের প্রলেপ দেবার লোক চাই। একদিন গীর্জ্জায় ঘণ্টা বাজত। লাইসেন্স নিয়ে টেঁসো চার্নকের কন্যা পিতৃ-পুরুষদের বংশধরদের অফিস উজ্জ্বল করত।

দুশো আড়াইশো বছরের ইতিহাসে আর ছেদ নেই, একই ধারায় চার্নকের দিশি কন্যার দল বংশবৃদ্ধি করে এসেছে। যাবার বেলায় মহানুভব ইংরেজ তাদের ভবিষ্যত গড়ে দিয়ে যেতে পারে নি অথবা দেয় নি। হঠাৎ বিদায় নেবার মত বলতে হয়েছে, ইয়েস মাই ডারলিং, আই লাভ্ ইউ, বাট্ আই লাভ্ মাই কাণ্ট্রি মোর দ্যান্ ইউ।

বড়ই নিরাশব্যঞ্জক পরিস্থিতি। স্বর্গরাজ্যের পরীর দলের ডানা কাটা যাবে একথা কেউ ভাবেও নি! ইংরেজ এত বেইমান তো ছিল না। তাদের উচিত ছিল, 'স্ট্রাইক দি টেণ্ট এণ্ড প্যাক দি উইমেন করা'। তা না করেই রওনা। তল্পীতল্পা তো বাপু এদেশেই রয়ে গেছে। তবুও তোরা কেন আমাদের বুকভেঙ্গে চলে গেলি! তোদের কোটি কোটি টাকার মুনাফা আজও তো তোরা পাচ্ছিস, সেই সাথে আমাদের মুনাফাটার ব্যবস্থা করে গেলে পারতিস। আমাদের প্রাপ্যটা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিয়ে গেলে তোদের কি সর্বনাশ হত।

যাদের হাতে আমাদের তুলে দিয়ে গেলি তাদের গায়ের বোটকা গন্ধে প্রাণ যায় যায় হয়ে এসেছিল। তাও ছিল রক্ষা, শেষ রক্ষা আর হল না। তল্পীতল্পা গুটিয়ে আমাদের ফিরে আসতে হয়েছে। টম্, হ্যারি, ডিক্ আর নেই, তাদের জায়গায় এসেছে ঝুনঝুনি, ফুলঝুলি, টুনটুনি, ওরা পয়সা চায়, রক্ত চায়, মাংস চায়, পয়সা দিতে চায় না। কাজেই ফিরতে হয়েছে। হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো পেট চলে না। সবাই তো সমান নয়।

চার্নকের উত্তরপুরুষ কপালে হাত দিয়ে টেঁসো পাড়ার রক পাহারা দিচ্ছে, কাপ্তেনী বাবুদের নাগাল খুঁজছে। যথা লাভ। সুপ-কারীর নাম ভুলে শাক-চচ্চড়ি খেয়ে ঢেকুর তুলছে। তোফা খানা। তোফা রুচি।

লালবাগের লাল-লাল বাচ্চারাও মাস কাবারে টেঁসোদের মতই দু'টাকা আড়াই টাকা মাসোহারা নিয়ে শাক-চচ্চড়ির ঢেকুর তুলতে তুলতে মোগল পাঠান যুগের স্বপ্ন দেখছে। হ্যাঁ, বাচ্চা হামারা ঠিক হ্যায়।

দোশো সাল পহেলা। হাঁ—হাঁ, দু'শো বছর আগে। লালবাগের আমের বাগানে বালি আর পাথরে তলোয়ার ঘসছে বীরপুঙ্গব বাঙালীর ছেলেরা। আজও বালি আর পাথরে অস্ত্র ঘসে বাঙালীর ছেলেরা হাত পাকাচ্ছে। আজকের এই অস্ত্র তলোয়ার নয়, আট ইঞ্চি মাপের ছুরি। সেদিন তলোয়ার ঘসছিল ইংরেজকে উৎখাত করতে, আজকে ছুরি ঘসছে নিরীহ পথচারীকে অতর্কিতে আক্রমণ করে অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নিতে, প্রয়োজন হলে তাদের খুন-জখম করতে। এই হোল দোশো সাল পিছেকে বাত।

হুকুম হয়েছে। নবাবী ফরমান বের হয়েছে।

কুচ্ সুরু হোক।

লালবাগের মাঠ পেরিয়ে পাঠান-মোগল, শিয়া-সুন্নী, খোট্টা-বাঙ্গাল, ছোঁড়া-বুড়া তলোয়ার হাতে ছুটছে।

সামনে ফেরিঙ্গি শহর কোলকাতা।

এঁদো বিল, পচা খাল, ঝোপ-ঝাড়-বাদাড় ভেঙ্গে নবাবী ফৌজ ছুটছে।

পেছনে রয়েছে তীরন্দাজ, গোলন্দাজ আর তুরুক সোয়ার।

গাদা বন্দুকে বারুদ ভর্তি হয়েছে।

ছুটছে ফৌজ।

ছুটল খবর ফেরিঙ্গি শহরে।

ফেরিঙ্গিরা তখন ইঁটের প্রাচীর দিয়ে কেল্লা গড়ছে, ভবিষ্যতের কেল্লা ফতে করবার মুখবন্ধ। তবুও ভরসা নেই। তারা জানে মাথার চেয়ে ইঁট শক্ত, ইঁটের চেয়ে শক্ত লোহার মুগুর।

খবর পেয়েই ল্যাজ গুটিয়ে পলতা থেকে ফলতা ছুটল।

রাতারাতি শহর খালি।

ভাটিতে জাহাজ ভাসল, প্রথম আশ্রয় নিল ফলতায়। চার্নকের উত্তরপুরুষের দল দুর্গাপুরের জঙ্গলে বোরখা ঢাকা দিয়ে চুপ করে বসে রইল। যারা জাহাজে জায়গা পেল না, তারা যীশুর নাম নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে রইল আজকের পোস্টাপিসের পেছনে। বুদ্ধিমানের দল পোড়া হাঁড়ি মাথায় দিয়ে গঙ্গায় গা ডুবিয়ে নোনতা জলে ভেপসে উঠতে লাগল।

নবাব দখল করল শহর।

নাকে খত্ দিয়ে মাপ চাইল ফেরিঙ্গি সর্দার! ইংরেজ বলল, সন্ধি হল।

আলিনগরের সন্ধি।

এসব ইতিহাসের কথা।

তারপর?

তারপর?

তাতো বলতে পারি না বাপু। ইতিহাস পড়ে শিখে নিও।

তবুও?

সেদিনকার সব কথা কি লেখা আছে। আজকের দিনে রাষ্ট্রপতি হাঁচলে তার রেকর্ড রাখতে হয়, মন্ত্রিরা ভ্রুকুঞ্চন করলে তার ফটো তুলতে হয়। সে-কালে ও-সব ছিল না বাপু। সেদিনকার লোকরা বড়ই সোজা ছিল। তারা হাঁচা-কাঁদার মধ্যে থাকতো না। খাঁচ্ করে লাগাও কোপ্, বাস্। ইহকাল পরকালের দায়দেনা মিটে গেল। টানা হাঁচ্ড়ার যুগে বাস করছি বলেই না এত কষ্ট।

তবে ক্লাইভ ছিল আসল মানুষ। আজকের দিনেও তার নামের রাস্তায় সমকর্মীদের সাক্ষাতে পাবে। গঙ্গার সাঁকো থেকে বড়বাজারের সারা তল্লাটে কয়েক হাজার ক্লাইভ বসে রয়েছে ওঁত পেতে। বিশ্বাস না হয়, আদালতের বিচিত্র কাহিনীটা উল্টে পাল্টে পড়ে দেখ। আজকের লোক বড়ই বেরসিক। জাল জোচ্চরি সইতে চায় না। ভাগ্যি ক্লাইভ স্বয়ং জালিয়াতি জোচ্চরিতে পোক্ত ছিল, নইলে এত বড় জমিদারিটা ইংরেজের হত কি? দেখ না, দু'শো বছর মেদ-মাংস ভক্ষণ করে কেমন হাড্ডি রেখে গেছে। তাই কি সুখ পাচ্ছে। বেনামিতে কালা সায়েবের মারফত কেমন কোটি কোটি টাকা পকেটস্থ করে ভেগে পড়ছে, অবশ্য কালা সায়েবদের অংশ কিছু দিতে হয় বই কি। এ হেন সুখের স্রষ্টা ক্লাইভ তো একবারেই মরতে পারে না, সকাল থেকে রাত অবধি তারই

বংশধর ঘুরে বেড়াচ্ছে আনাচে কানাচে। ক্লাইভ মরলেও তার ভূত এখনও মরেনি।

এমন গুণবান পুরুষ ক্লাইভ এল ফেরিঙ্গি শহর কলকাতায়। এসেই তুলোট কাগজের জবানবন্দী ফর-ফর করে ছিঁড়ে ফেলল। ড্যাম্, রাবিশ। আমরা এসেছি এদের মানুষ করতে। প্রভু যীশুর প্রেরিত আমরা প্রাচ্যের ত্রাণকর্ত্তা। আমাদের সাথে কিনা Black Nabob এর সন্ধি, ছোঃ!

তলোয়ারে শান লাগাও।

ভাঙ্গা বন্দুক জোড়া লাগাও।

তোপমে বারুদ ভর্তি কর।

কিন্তু লড়বে কে? —পাঁচ সাতশো কি হাজার ফেরিঙ্গির সাধ্য কি মুর্শিদাবাদের রাস্তায় পা দেয়।

ক্লাইভকে ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করল, তোপ কোথায়?

তোপ! মীরজাফর আর রায়দুর্লভ।

আর বারুদ?

নিজের মাথায় হাত দিয়ে ক্লাইভ বলল, এইখানে জমা আছে।

দিশী লোক নবাবের বিরুদ্ধে লড়তে চায় না।

জাহাজ বোঝাই করে তেলিঙ্গা নিয়ে এস।

তেলিঙ্গার অনেক সুবিধা। তেঁতুলের ঝোল পেলেই ওরা খুশী। মাসে দেড়-টাকা মাইনেতে ঘণ্টায় তিনটে মাথা কাটতে ওরা কসুর করে না।

যদি হার হয়?

হার ও জিত দুই-ই সমান। আমাদের থোরাই লোকসান। মরবে তেলিঙ্গা। ফাঁসি হবে মীরজাফরের আমরা জাহাজ ভাসিয়ে নতুন কলোনীর পত্তন করব। যাবার বেলায় পথে ঘাটে যা পাব লুটে নিয়ে যাব। লোকসান সুদেমূলে আদায় হয়ে যাবে।

ইংরেজি বাদ্য-যন্ত্রে 'গড্ সেভ্ দি কিং' বাজনা সুরু হল। তালে তালে পা ফেলে তেলিঙ্গা সিপাই মার্চ করল। পেছনে চলল ফেরিঙ্গি সেপাইয়ের দল।

পলাশী! হায় পলাশী!

মহরমের লাঠি খেলার পাঁয়তাড়া কসতে কসতেই নবাব ছাউনি ছেড়ে দিল

চোঁচা দৌড়। আঠারজন ঘোড়সোয়ার হঠিয়ে দিয়েছিল রাজা লখমণিয়াকে। আর পৌনে আঠারজন ফেরিঙ্গি হঠিয়ে দিল নবাব সালাবতজঙ্গ বাহাদুরকে। পলাশীর দাঙ্গায় ইংরেজের জয় জয়কার। খোদার কসম, এ লড়াই ফতে করতে দশগণ্ডা মানুষ ফতে হয়নি সেদিন। তাতেই বা কি। ইংরেজ লিখল, 'Battle of Plassy'—ভাগ্যি প্রাক-ঐতিহাসিক 'Great War' লিখে যায়নি। আমাদের নিরেট বংশধর ইংরেজের ইতিহাস রাত জেগে মুখস্ত করে পরীক্ষার খাতায় না লিখে ছাড়ত না।

নাথিং রং ইন্ লাভ এণ্ড ওয়ার।

ক্লাইভ খাঁটি লোক। ততোধিক খাঁটিলোক মীরজাফর। কথায়। কাজে তাদের কোথাও একচুল ফারাক ঘটে নি।

নবাব পালাল। আলিবর্দ্দির দুলাল বেগমের আঁচল ধরে পশ্চিমের পথ ধরল। পশ্চিমে তখন সূর্য ডুবু ডুবু। সূর্য না ডুবতেই, নবাব ডুবল। নবাব কোতল হল। ক্লাইভ মীরজাফরকে কুর্ণিশ জানিয়ে গদীতে বসাল।

মীরজাফর রেখে গেল ঐতিহ্য।

প্রেসিডেন্সী জেলের শেষ কোনার টানা দালানে আশ্রয় পেল লুতফুন্নেসা। সুবে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রাক্তন রাজ্ঞী। কচি জহর মায়ের বুকের উষ্ণতায় জন্মদাতার উষ্ণরক্তের বিভীষিকা বিস্মৃত হল। জেলখানায় বাড়ন্স কি কমল বাংলার নবাবী তক্তের শেষ রোশনাই তা ইংরেজ হলফ করে লিখে রাখেনি। ইংরেজ লিখে গেছে শুধু তাদের বীরত্ব কাহিনী।

হাঁ, বীর বটে ইংরেজ!

বীরত্ব তাদের ঐতিহ্যের দাবী রাখে। সিংগাপুরের বীরত্ব অনেকেই আজও ভুলতে পারেনি। ফ্রান্স আর নরওয়ের মহাযুদ্ধে যে মহাবীরত্ব প্রদর্শন করে ইংরেজ যুদ্ধ জয় করেছে সেকথা আজও আমরা স্মরণ করি। ভাগ্যি ভারত-বাসীর হাতে লাঠি ছিল না, আর ছিল না মীরজাফরের অভাব, তাই পলাশীর গাদা বন্দুক দিয়েই বীরত্ব জাহির করে আসতে সাহস পেয়েছে দুশো বছর ধরে।

যাক মিটে গেছে।

ইংরেজ গেছে, তার ভূত রয়েছে। নইলে শহর কোলকাতার ইতিহাস লিখতে হত না।

ইংরেজ রাজা হলেও হাঙ্গামা মিটল না।

টাট্টু চড়ে হাওয়ার আগে ছুটে আসে বর্গীর দল। ঝড়ের বেগে আসে ঝড়ের বেগে যায়। ভাস্কর পণ্ডিতের মাথা কেটেও ঘোড়ার পা ভাঙেনি। অলিবর্দি টাকা দিয়ে রেহাই পেয়েছিল, কিন্তু ইংরেজ নিতে এসেছে দিতে আসেনি। বর্গীরাও শোনার বান্দা নয়। রূপি নিকালো। তুমচে হামচে ফারাক ন আহে। রূপি দো। ফ্যাসাদ কম নয়। শহর বাঁচাও।

বাঁচাও বল্লেই বাঁচে না। কিন্তু বাঁচায় কে?

ইংরেজের জাহাজ রয়েছে। হট্টগোলে ভেসে পড়ে তারা। যারা ঘর বাড়ি করে বসত করে তাদেরই ফ্যাসাদ, যুক্তি করে কোলকাতার বেনেরা খাল কাটল। খাল বেয়ে বিলাতী কুমীর এল, বর্গীরা বাধা পেল। এই খালের ওপারে আলিনগর। সাদা কাপড়ের তাঁবু দিয়ে নগর বসেছিল। সে নগর উঠে গেছে। নগরের মালিক জাফরাগঞ্জে মাটির তলায় শুয়ে রোজ কিয়ামতের দিন গুনছে। যারা কুঁড়ে বেঁধে বাস করছিল তারা উঠে এল খালের এপারে। উল্টাডাঙ্গায় সোজা মানুষ বাস করতে নারাজ। শহর তখন গম গম করতে থাকে। ওপারে বাঘে শেয়ালে রাজত্ব করে। এঁদো পুকুর, মজা ডোবায় মশারদল রাতের বেলায় কোরাসে সানাই বাজায়; এপারে তখন বলনাচ আর বুলবুলির লড়াই চলে।

কোলকাতার বেনেরা আর বাগবাজারের বাবুরা তখনও টের পায়নি, কার জন্য খাল কাটা হল। নিরাকার ভগবানের তখন বয়স বেড়ে গেছে, চুলগুলো সাদা ধবধবে, মুখ গহ্বরে দন্ত নামক বস্তু একটিও নেই, বহুকাল ত্রিভুবন পালনের বহু কঠিন দায়িত্ব পালন করতে করতে বহুমূত্রে ভুগছেন, অতএব তিনি আর মুখ তুলে দেখবার সময় পেলেন না। সবার অলক্ষ্যে ইংরেজের তৌলযন্ত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র এসে উঠল। কষ্টি পাথরের তক্ত শক্ত হয়ে বসল কেল্লার চবুতরায়। নবাব গেল, নবাবী গেল না। সুর্মা চোখে দিয়ে রঙীন জীবনের স্বপ্ন দেখে মীরজাফরের বংশধর। ভোগ্যভোজ্য জোটায় ইংরেজ, আঙুরের রস সেবন করে লালবাগের লালের দল, পলাশীর ভাঙ্গা তলোয়ার দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখে জঙ্গী জীবনের স্বপ্ন দেখে।

সেদিনকার সেই খালের জলে গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরতে হবে একথা তারা ভাবেনি। বাই নাচ আর খেমটা, বুলবুলি আর লক্কা পায়রা, আতর আসব, এ সব নিয়ে বোধ হয় ভবিষ্যত গড়ে উঠবে, এই ছিল স্বপ্ন।

সেদিন দেশকে বেচে দিয়েছিল ফেরিঙ্গির কাছে। সেদিন তারা ভাবেনি, উত্তরপুরুষ বসত বাটি বেচে দেবে পকেটকাটিয়াদের কাছে। রুল অব থ্রি, এ-পি, জি-পির অঙ্কের মত দুঃখটাকে যোগ দিয়ে চলেছে, গুণ দিয়ে চলেছে, বিয়োগ দেবার পথ জানা নেই তাদের। দেশী ফেরিঙ্গির কাছে ঘরবাড়ি বেচে অনেকটা হালকা হয়েছে। তবুও ভাড়াটে বাড়িতে চোখের লালিমা কমছে না। আজও হাত শুঁকছে, পিতৃপুরুষ ঘি খেয়েছে, সেই গন্ধ হাতের তেলোতে চট্‌ চটে হয়ে যেন লেগে আছে। কোলকাতার উত্তর-পুরুষ পকেটকাটিয়াদের অফিসে তিরিশ টাকার নোকরি খুঁজছে। নোকরি না পেলে নিমতলার লকড়িই শেষ সন্ধান। দুশো বছর আগে এমনি ধারাই মীরজাফরের বংশধররা হাত পেতে থাকত। আজও দুই থেকে দুশো টাকা অবধি হাত পেতে নিচ্ছে তারা। লালবাগের খাজাঞ্চীখানায় লাইন পড়ে কণ্ট্রোলের চাল নেবার মত। মীরজাফরের উত্তর পুরুষদের কিছু পাবার মত হক আছে, কলকাতার প্রথম মানুষদের উত্তর পুরুষদের তাও নেই।

একমাত্র সান্ত্বনা রোয়াক। বেঁচে থাক পূর্বপুরুষের নাম। বাড়ি হাত ছাড়া হলেও রোয়াক হাত ছাড়া হয়নি। সকালে বিকালে, বিশেষ করে মেয়েদের স্কুল কলেজ যাবার সময় রোয়াকে বসে যায় রকফেলারের দল। রাজা উজির বধ পর্ব শেষ করে তবে জল গ্রহণ, সে জলও গৃহের নয়। সামনের চায়ের দোকানের গরম পানীয় প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে ব্লাডারের গোপন তরল পানীয়। এদেরই পূর্বপুরুষ কোলকাতার ঐশ্বর্য বাড়িয়েছে, বাংলার গরিমা বৃদ্ধি করেছে, দান খয়রাতের রাজাধিরাজ ছিল এরা।

আর আজ! চাঁদবেনের ছেলেরা ভেলায় ভাসছে। ঘরে সনকা কাঁদছে, বেহুলা কাঁদছে, লখীন্দরের পেটে ইঁদুর ওরিয়েণ্টাল ড্যান্স করছে। পেট চোঁ-চোঁ করে, মানে না মানা। অবেনের দলও রোয়াকে আড্ডা দেয়, সিনেমায় লাইন দেয়, লুকিয়ে লুকিয়ে গাঁজা তাড়ি খায় আর খায় পুলিশের গুঁতো।

আর বিঘের হিসাব নেই, কাঠার হিসাব। 'শুধু কাঠা দুই ছিল মোর ভুঁই তাও বুঝি যায়; পাওনাদার কহে, শোন বাপু হে, এবার বিকাও তায়'। আর শোন শুধু হায়, হায়। কাজ নাই, কাজ দাও। কে দেবে? সে কথা ওরাও জানে না, যাদের দেবার দায়িত্ব তারাও জানে না।

রোয়াকের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

যাদের দায়িত্ব তারা বড় হুঁসিয়ার। তারা বলে, দারিদ্র মোচন না করলে আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসবে না অতএব যুদ্ধকালীন প্রচেষ্টার মত করে দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু কে করবে! বক্তা? যিনি পাঁচহাজারী মনসবদার তিনি, না আমি এবং তুমি। ঠাট্টা নয়। দেড় হাজার টাকা মাইনে পেলে তুমি কি আর বুনিয়াদি শিক্ষণ-শিক্ষকের মত পায়খানা পরিস্কার করতে ইতস্তত করতে, নিশ্চয়ই করতে না। কিন্তু তাতে দারিদ্র কমত কি? দেড়হাজারী মনসবদারের পদে বসে নিজের দারিদ্র যদি মোচন করতে পার সেটাই বড় কাজ, অপরকে তখন বানী শোনাতে পারবে। কিন্তু বানী দিয়ে রকফেলারের দল কমবে না, বরং দল ধীরে ধীরে বাড়বে। তা বাড়তে থাকুক। তোমার আমার তাতে কি এসে যায়। আমরা তো মোক্ষলাভ করেছি। রকফেলারদের উৎপাত বাড়লে পুলিশ ডাকতে কতক্ষণ। যারা জখম হবে তাদের জন্মই জখম হবার জন্য।

আমাদের নগাদাকে চেন তো? দেশসেবার পুরস্কার স্বরূপ নগাদা সরকারী সাহায্য পাচ্ছে। দেশের জন্য তার ত্যাগের সীমা নাই। শুধু শত্রুপক্ষ বলছে, নগাদা তিনশত ছেষট্টি ধারার আসামী ছিল। দেশ ভাগ হওয়াতে রেকর্ড পাওয়া যায় নি। মাথামোটা লোকের সুপারিশে মোটা মাসিক বরাদ্দ হয়ে গেছে।

অবশ্য নগাদাকে একথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস পাইনি।

নগাদা এখন মস্ত বড় লোক। আমাদের পরলোকযাত্রী পত্রিকার নিজস্ব সংবাদ-সংগ্রাহক। নামজাদা পল্লীতে তার চেয়ে অপরের নাম বড় বেশি শুনতে পাবে না।

নগাদা বলল, কি সুখেই আছি ভাই তা বলবার নয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, বউদির বুঝি অসুখ?

বউদির চেয়ে বড় একজনের অসুখ, বুঝলি ভাই। এটা অ-সুখ।

সে আবার কি?

চাকরি। মনিবের বড়ই অ-সুখ। কাগজের চাহিদা বাড়ছে। জানিস তো, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন যদি বেশি আসে আর চাহিদা কমে যায় সেটাই লাভ কিন্তু আমাদের দুটোই হয়েছে। বিজ্ঞাপনও বেড়েছে, চাহিদাও বেড়েছে। আমরা যারা লিখি তাদের ওপর মনিবের রাগ বেশি। কম্যুদের মিটিং হচ্ছে, লোক হয়েছে দু'লাখ, আমাদের বলতে হবে দশ হাজার ঃ আর মনিবের দলে

লরীভাড়া করে লোক এনে বড় জোর দশ হাজার লোক জমায়েত করলে বলতে হবে দু'লাখ। এ এক মহা ফ্যাসাদ। কাগজের চাহিদা নাকি আমাদের লেখার জন্যই বাড়ছে, মনিব তা চায় না।

বললাম চাকরি চাকরি।

তা বটে। আমার বিমল বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হাঁরে বিমু তুই তো ইংরেজের অতি বশম্বদ ছিলি, তারপর পদলেহী লীগের, তারপর, আর বলতে হল না। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, উই আর লয়েল টু সার্ভিস। এরপর কম্যু আসলেও আমরা লয়েল থাকব।

গণতন্ত্রে এটাই নাকি আবশ্যক।

অত্যধিক। বুঝলি, যেদিকে জলের স্রোত সে দিকে গা ভাসিয়ে দাও। আসল কথা পয়সা। তবে কিনা আমরা সব নির্যাতীত কর্মী, আমরা ঠিক য়্যাডাপ্ট করতে পারি না। ভাবছি চাকরিটা ছেড়ে দেব।

নগাদা আজও চাকরি ছাড়েনি। দশ হাজারকে দু'লাখ, দু'লাখকে দশ হাজার লিখে দিব্যি মোটা বেতনে চাকুরি করছে, সেই সাথে সরকারী পেনসন।

ওপাড়ার রোয়াকে যারা বসে তারাই সুখী। অ-সুখ তাদের কম। পিতৃ-দেবের হোটেলে বরাদ্দ থাকে, যাদের থাকে না, তারা সুযোগ পেলেই স্নানার্থীর গলার মালা ছিনিয়ে নেয়, না হলে কপালে চন্দন মাখিয়ে পুণ্য পিয়াসীদের স্বর্গপথের দরজা খুলে দেয়। সপ্তাহের সাতবারের সাতটা পূজোর ফিরিস্তি তাদের কণ্ঠস্থ। কোথায় কত দক্ষিণা দিলে মোক্ষলাভ হয় তাও তাদের নখদর্পনে।

এরা মক্কেল চেনে। কাকে পাকড়াও করতে হবে আগেই সন্ধান করে রাখে।

নিমাই মিত্তির সকালবেলায় গঙ্গায় এলেই পেছন পেছন একদল এসে ভীড় জমায়। শেতলাতলা, শনিতলা ইত্যাদির দক্ষিণা আদায় দিয়ে মিত্তির মশায় ঘরে ফেরে।

রকফেলারের অনেকেই জানে নিমাই মিত্তির কি করে।

ছ'খানা পৈত্রিক বাটি।

ভাড়া, ছ'আধে তিন হাজার।

স্বয়ং অবিবাহিত, গলায় তুলসীর মালা, কপালে চন্দন, বৈষ্ণব বললে ভুল হবে। সাক্ষাত বিষ্ণুর অবতার, এক কথায় কলির কেষ্ট।

নিমাই মিত্তিরের অনুগ্রহ ভাজন ব্যক্তিরা জানে, নিমাই মিত্তির এক নারী

নিয়ে একমাসের বেশি ঘর করে না। ব্রহ্মচর্য্যের অবসান ঘটাতে রাজি নয়। অবিবাহিতা অথবা বিধবা হলে নিমাই মিত্তির তাকে পত্রপাঠ বিদায় করে দেয়। প্রথম জীবনে এইরকম ভুল করায় দুই দুইবার হাজতবাস করতে হয়েছে। গুরুর কৃপায় কোন রকমে রেহাই পেলেও অভিজ্ঞতাটা তার মূল্যবান। অতএব নিমাই মিত্তিরের পার্শ্বচরের অভাব নেই।

বন্ধুজন কেউ ঠাট্টা করলে নিমাই মিত্তির শুকনো হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে, ওরা গরীব, দুটো পয়সা কামাই করতে আসে। আমার আছে তাই তো আসে। যাদের নেই তারা পয়সা খুঁজে বেড়াবে, যাদের আছে তারা পয়সা দেবে। এই তো পৃথিবীর নিয়ম। স্বয়ং প্রভুও এই কথা বলে গেছেন। তোমরা কম্যু হয়েছ, তোমাদের মার্কস সাহেবও এই কথা বলেছে। বলতে পারি, আমার মত কম্যু পৃথিবীতে কমই আছে।

নারী দেহপণ্যের এমন রসাল অর্থনৈতিক যুক্তি বোধ হয় আর কেউ দিতে পারেনি আজও। আমরা অবাক হয়ে তার অনুচরদের কাছে শুনতাম, তার নির্লজ্জতার জন্য নিজেরাই লজ্জিত হতাম।

নিমাই মিত্তির বলে, আগে বুলবুলির লড়াই হত। আহে সেদিন তোমরা ছিলে কোথায়! উড়ে বেড়ানো বুলবুলির লড়াইয়ের আসল অর্থ মানুষের জীবনে এসে পৌঁছাত। বুঝলে?

তাতেই বাবুদের সব ফুঁকে গেছে, এখন তো হাতে মালাই।

পৃথিবীতে সবই ফুঁকে যায় বন্ধু। অশোকের মত মহান রাজা সেও ফুঁকে গেছে, আমি তুমি কোন ছার। এখনও আমি চোখ বুঁজলে বুলবুলির লড়াই দেখতে পাই, বুঝলে? মনে হয়, আসর বসেছে, পেশোয়াজ পরে বাইজিরা গান করছে, ঝাড়-লণ্ঠনের আলোতে আসর চক্‌মক্ করছে। সামনে লড়াইয়ের বুলবুলি। দেশি বিদেশী সায়েব মেমে ঘর ভর্তি। কে কার গালে ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছে তার নেই ঠিক। এ লড়াই তোমরা দেখনি হে, তাই তোমাদের আপশোস।

এ হেন নিমাই মিত্তির সকালে গঙ্গাস্নানে না গিয়ে পারে। অতএব প্রার্থীর দলের অভাব কখনও হয়নি। প্রার্থীর দলের কেউ কেউ তার অভিসারের সাকরেদ। পয়সা কামাই তারাও করে।

নুন গোলার পাশ দিয়ে সোজা সড়ক যেখানে গঙ্গায় মিলেছে সেখানে

মাঝে মাঝে সাধুবাবাদের আবির্ভাব হয়। ধূনি জ্বলে, গাঁজার ছিলিম বদল হয়। শিষ্যসাবুদ যেন প্রস্তুত হয়েই থাকে। সাধুবাবাদের আবির্ভাবের সাথে সাথে শিষ্যসাবুদ হাজির হয়। সোজা রাস্তাটা যেখানে পশ্চিমে মোড় ফিরল সেখানেই তাদের আস্তানা। সাধুবাবাদের আবির্ভাব ঘটলে রোয়াকি রকফেলার-দের কাজের হিড়িক পড়ে যায়। ওপাড়ায় নিমাই মিত্তির মার্কা অনেকের গতায়াত থাকে, তাদের পকেটে হাত পড়ে। কেউ লজ্জার মাথা খেয়ে, কেউ বুক ফুলিয়ে চাঁদার টাকা এগিয়ে দেয়। রোয়াকবাজদের দিন ভালই কাটে।

মরশুম শুরু হয় পূজায়, শেষ হয় দোলে। শরতে উদয় বসন্তে অস্ত।

চাঁদা দাও। সর্বজনীন পূজা। জন সর্ব না হলেও গোটা কয়েক বটে। তাদের দয়ায় অলিতে গলিতে পূজো।

চাঁদা দাও। না দাও, দেখে নেব।

মা দুর্গা হাসল, বাড়ির ছেলে মেয়ে কাঁদলো কিনা বোঝা গেল না বাপ-মা অন্তরে অন্তরে প্রার্থনা জানাল, আর এস না মা। তোমার আগমন আর আমাদের মরণ একই কথা।

খেঁদি বলল, ফরক্ দাও।

বুচি বলল, কাঞ্জিভরম্।

ক্যাবলা বলল, নিউকাট।

হ্যাবলা বলল, হাওয়াই।

গিন্নী চপসে গিয়ে বলল, রান্নার জন্য তাঁতের কম দামী শাড়ী।

রকফেলাররা বলল, মশাই পাঁচ ট্যাকা।

যার মাস চলে না তার পক্ষে নিদেন আফিম্ খাওয়া ভিন্ন পথ থাকে না। সে পয়সাও নেই, নইলে আফিম্ খাওয়া হয়তবা অসম্ভব হত না।

হাত জোড় করে প্রার্থনা জানাই। জয় মা দুর্গা, তোমার চণ্ডীর পাতায় মুনি ঋষিদের লিখতে বলে দাও, শাড়িং দেহি, চাঁদাং দেহি, পুত্রাদিং জহি। নইলে যে মা প্রাণ রাখা দায়। গৃহে গৃহিনী, গৃহদ্বারে পুত্রকন্যা, সদরে

বাড়িওলা, রাস্তায় রকফেলারের দল, এদের হাত থেকে বাঁচাও। বাঁচা আর হল না, মরণও এল না। দর কষাকষি করে ফুটপাতের ফ্রক, বেগমপুরের মেঠো শাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি শেষ করে তিনটি মুদ্রা রকফেলারি দক্ষিণা দিয়ে নিষ্কৃতি।

নিষ্কৃতি! ছোঃ।

কানের কাছে অবিরাম বেজে চলেছে, 'লারে লাপ্পা'।

বাঁচা গেল। খেঁদি বুচি ক্যাবলার দল ঘরে নেই। রসিকতা করে গিন্নীকে বললাম, কেমন পুজো কাটছে।

তোমার মত নিকম্মা লোকের হাতে পড়ে পুজো কি আর কাটছে! নেহাত ভাল মানুষের মেয়ে বলে ঘর করছি, নইলে নুড়ো জেলে দিতাম। না একটা শাড়ি, না একটা ভালমন্দ খাবার। কেবল বছর গেলে কাঁথা শেলাই কর। লজ্জাও হয় না।

আহা মা দুর্গা। বেচারা সিংহ যদি মাটির পুতুল না হত তা হলে দাঁড়িয়ে যেতুম সিংহের সামনে। তার এক বেলার খোরাক হত। শুকনো দেহটা চিবিয়ে সুখ পেত না, তবে পেটটা ভরতো। তাতেই তোমার সেবা হত মা।

রোয়াকিদের কি কর্ম কাণ্ডের শেষ আছে।

মা বিদায় নিতে না নিতেই মা কালীর চাঁদা। হাঁ মা বটে। এত রক্ত খেয়ে মায়ের পেট যে ভরেনি তাতো জানি না। আমার শুকনো বুকের রক্ত পান বুঝি বাকি ছিল তাই মা আসছেন। গরীব ছেলের দুচার ফোটা রক্ত না খেয়ে ফিরবেন না। নন্দীভৃঙ্গীর দল খাঁড়া হাতে সামনে দাঁড়িয়ে। চাঁদা দাও। দেবে না, আচ্ছা দেখে নেব।

কি যে দেখে নেবে তা জানি। দিনের আলোতে ওরা ভাল দেখে না। রাতের আঁধারে ওদের চোখ চক্ চক্ করে আর চক্ চক্ করে হাতের ছুরি।

চাঁদা অবশ্য দেয়। বাজেটের বড় আইটেম।

সর্বজনীনের কর্মকর্তা নামজাদা লোক। বাড়ির মালিক, মস্ত ট্রেড। সভা সমিতিতে গতায়াত যথেষ্ট। এহেন ব্যক্তি কর্মকর্তা অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট। নামের ফিরিস্তি দেখলে হাঁ করে থাকতে হয়। পৃষ্ঠপোষক যে কে নয় তা বলা কঠিন। গভর্ণর থেকে চৌকিদারের নাম থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না বরং শান্তি ছিল। যাদের নাম রয়েছে তাদের খ্যাতি রয়েছে, কুলোক অখ্যাতির কথাও বলে। এহেন ব্যক্তিবর্গের বিরাগ ভাজন হওয়া সাধ্য কার।

অতএব, হে মা কালী গরীব ছা-পোষা এই কেরাণীর রক্ত খেয়ে তুমি খুশী হও। তোমার সামর্থ্য জানি না, কিন্তু যাদের নাম ছাপার অক্ষরে রয়েছে তাদের সামর্থ্য অনেক বেশী, সেই ভয়েই তো আমাদের এত ভক্তি।

এর পরেই বিরাট অনুচ্ছেদ। সরস্বতীপুজো অবধি রকফেলারের দল বেকার। উদ্বৃত্ত পয়সায় চা পান সিগারেটের খরচ অনেকদিন চলে, সেটা ফুরিয়ে গেলেই সবাই বেকার। মানুষ বেকার থাকতে পারে কত দিন! তখন আসে কটেজ ইণ্ডাস্ট্রীর কমপিটিশান। চুপে চুপে ঘরে ঘরে চোলাই হতে থাকে, না হয় পাইকারি হারে তৈরী হতে থাকে বোমা পটকা। বাঙ্গালীর উদ্ভাবনী মস্তিষ্ক নতুন কাজে নেমে পড়ে। নেহাত যারা তাও পারে না তারা আবগারীর পুরিয়া বিক্রী করে বেড়ায়।

রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের দেশের ছেলেদের ঐতিহ্য একটা কিছু আছে বই কি।

ওপাড়ার পরলোকযাত্রী পত্রিকার কর্মীগোষ্ঠী বিরাট সম্পাদকীয় লিখছে, শক্তির ক্ষয় হতে দেখে আঁতকে উঠছে। উপদেশ অনুজ্ঞা অনেক কিছু জাহির ও হাজীর করে তারা চৌরঙ্গীতে ছুটলো গলাটা ভিজিয়ে নিতে। মনিবের মন রক্ষা করতে হলে নিজেদের দেহকে রক্ষাকরা দরকার। কখনও দেহ ফুটপাতে কখনও নর্দমায় রক্ষা করে যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে মোটেই বেগ অনুভব করে না। শুধু বাকি রয়েছে দেহরক্ষার। ওটুকু হলেই নিরেট বাঙ্গালী বোধহয় বাঁচত।

নগাদা বলত, জানিস, দু'ভাবে বড় হওয়া যায়।

কেমন ?

খবরের কাগজ চাই। হয় নিজস্ব, না হয় বন্ধুর। হাতে ঝাঁটা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাবি, ফটো ছাপা হবে, তখন হবি সমাজকর্মী। আর মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিবি। শ্রোতা থাকুক না থাকুক ফলাও করে ছাপা হবে, তখন হবি দেশসেবী। তবে সেটা বিনি পয়সার ব্যাপার নয়। যোগাযোগ সুপারিশ দুটোই শক্ত হওয়া দরকার। দেশও তোর নয় সমাজও তোর নয়, এটা বুঝে পা ফেলবি।

সবাই কি খবরের কাগজের কথা বিশ্বাস করে ?

নিশ্চয় করে। আজ না করলে কাল করবে, কাল না করলে পরশু অর্থাৎ

সেই বামুন ও ছাগলের গল্প জানিসতো, ছাগলটা শেষ পর্যন্ত কুকুর মনে করেই বামুন ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। তেমনি হল খবরের কাগজ। হররোজ রামচরণের কথা শুনতে শুনতে রামচরণকে সমাজকর্মী আর দেশসেবী ভাবতে কারুরই অসুবিধা হবে না।

আর কি ভাবে বড় হওয়া যায় ?

সেটা বড় কঠিন ব্যাপার। যেমন দল চাই। দল রাখতে হলে কিছু পয়সা চাই। দলের বেকারের দল শুকনো মুখে আজকাল আর 'জয় হোক' বলতে চায় না। মাঝে মাঝে চা-পান-গাঁজা-ভাঙ্গ এসবের খরচ জোটাতে হবে। মাঝে মাঝে থানায় গিয়ে জামিন হতে হবে। ধীরে ধীরে সার্বজনীন দাদা হতে হবে। দাদার ক্লাশে প্রমোসন পেলেই বড় হবার পথ খুলে যাবে। তখন চাই বুদ্ধি। স্রোত দেখে গা ভাসিয়ে দাও, পয়সাও উপায় হবে, নামও হবে।

যেমন ?

যেমন, ভোট যুদ্ধ এল, হাত মেলাও কারুর দলে। যাদের পাল্লা ভারী তাদের পাল্লায় পা দাও, দেখবে কেল্লা ফতে। নিজের দলকে দুটো ভাগ করে দু দলে ভিড়িয়ে দেবে, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মত। নারায়ণী সেনা রইবে দুর্যোধনের আর সাত্যকি ইত্যাদি রইবে পাণ্ডবপক্ষে আর তুমি শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ হাতে নিয়ে নিরপেক্ষ হয়ে নতুন করে গীতা লিখে ফেলবে। ধর্ম অর্থ দুটোই তোমার দরজায় চুপি চুপি হামাগুড়ি দিয়ে আসবে। আর আসবে উভয় তরফ থেকে। নীতি দুর্নীতির বুলি ছাড় দেখি। আগে দেশ ছিল হেঁদুর, তারপর হল মোছনমানের, তারপর কেরেস্তানের। এখন দেশ আর কারুর নয়। যার পয়সা তার দেশ। ঝুনঝুনি টুনটুনিদের পয়সা আছে, দেশ তাদের। তুমি আমি ফোকটে কিছু হাতড়ে নিয়ে গৃহধর্ম পালন করব বইতো নয়।

তারপর।

দেখছিস ঐ চিৎপুরেশ্বরী মন্দির, ওখানে এক সময় নরবলি হত। আজকাল নরবলি হয় না তবে নরের মুণ্ড কাটা না গেলেও মস্তিষ্ক কাটা যায়। বটগাছের চারধারে যারা ভীড় করে তারা বড়ই ভদ্র। ভদ্রঘরেরই অনেক ছেলে রোয়াকে জায়গা না পেলে ট্রেনিং নিতে আসে ওখানে। প্রথমে গাঁজার, তারপর

চোলাইয়ের আর দরকার হলে পকেট সাফ করবার। ওরাই দল বেঁধে এসে বড়দের সেবায় লেগে যাবে। বুঝলি। সবাই কি বড় হতে পারে, হিম্মত চাই।

নগাদার অফিসের বেলা হয়েছে, জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে গেল।

সরস্বতীপূজো শেষ হলেই ওপাড়ার রোয়াকি বন্ধুদের কপালে জোটে বেকারী আর পুলিশের গুঁতো।

রাতারাতি রোয়াকি বন্ধুরা সাহিত্যিক অথবা সাহিত্যধর্মীতে পরিণত হয়। নববর্ষে কবিগুরু বন্দনার বিরাট বন্দোবস্ত হয় চারিধারে। আবার বের হয় চাঁদার খাতা। দুর্গাপূজার চাঁদায় কালীপূজা কাটে। কালীপূজার চাঁদায় সরস্বতীপূজা কাটে। সরস্বতীপূজার চাঁদায় টান পড়লে সুরু হয় কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি। তারপর সাহিত্যের জাগরণ। এ চাঁদাও ফুরিয়ে যায়। তারপর? রোয়াকি বন্ধুরা ভাবছে এবার থেকে সার্বজনীন জামাইষষ্ঠী করলে কেমন হয়! নেহাৎ পক্ষে সার্বজনীন নষ্টচন্দ্র!

আলিনগরের খালের আরম্ভ চিৎপুরেশ্বরীর মন্দির থেকে। বর্গীর হাত থেকে বাঁচতে চেয়েছিল কোলকাতার মানুষ। বাঁচল কোথায়! দক্ষিণী বর্গীর রাস্তা বন্ধ হলেও, উত্তরী পঙ্গপালের দল মরুভূমি পাহাড় পর্ব্বত পেরিয়ে ছুটে এসে আলিনগরের খালের দু'পাশে আড্ডা গড়ে তুলেছিল। প্রথম যারা এসে ছিল তাদের সম্বল ছিল লোটা-কম্বল।

বাবুদের পেয়ারের দারোয়ান ছিল ওরা। একদিন দেখা গেল দারোয়ান হয়েছে বাড়ির মালিক আর বাবুদের উত্তরপুরুষ সেখানে কলম পিষছে। জমি শুধু হাত বদল হচ্ছে। বীরবলের ভাষায় বলতে হয়, তিন পুরুষ। কলকাতার বাড়ি আর জমি তিন পুরুষেই খালাস, বড় জোর চার পুরুষ। দু'শো বছরে কম করেও দু'বার হাত বদল হয়েছে কলকাতার জমি। পিরিলি বামুনদের জমি হাত বদলে এসেছিল দত্তদের কাছে। দত্তদের হাত বদলে পৌঁছে গেছে ঝুনঝুনিদের হাতে। আর একশ বছর পরে কার হাতে পৌঁছাবে তার হদিস এখনও করা যায়নি।

নগাদাও বলত, জানিস ইংরেজ যখন খাস কলকাতার মালিক তখন শীল্ড আর লীগ পেত ইংরেজের টিম, তারপর মুসলীমলীগের রাজ্যে পেয়েছে মহমেডান ক্লাব, এখন পাবে রাজস্থান টিম। ওরা এখন কলকাতার খাস

মালিক! শতকরা পঞ্চাশ ভাগ জমির মালিক ওরাই, বাংলাদেশের মূলকেন্দ্রে বাঙ্গালীর সংখ্যা শতে ষাট জন। রাজনীতির ঢেউটা এবার বুঝলি।

বললাম, মোহনবাগান আর ইষ্টবেঙ্গল টিমও তো লীগ আর শীল্ড পাচ্ছে।

কচু পাচ্ছে। মোহনবাগান ছিল বাঙ্গালীর টিম। আজ ভাল করে নাম-গুলো পড়ে দেখিস, ওদের কজন বাঙ্গালী তা নিজেই ঠিক করতে পারবি। ওখানেও ঐ রাজস্থানীর দল খুঁটি গেড়ে বেনামীতে টিম চালাচ্ছে। আর ইষ্টবেঙ্গল?—ওটা ইষ্টও নয় বেঙ্গলও নয়। লজ্জার মাথা খেয়ে আমরা রাস্তায় মারামারি করছি। আসলে ওখানেও বেনামিতে টিম চলছে বুঝলি।

অর্থাৎ বীরবলের ভাষায় হাত বদল হচ্ছে। না হয়ে উপায় নেই। সূর্যচন্দ্রের মত মানুষকেও ওঠানামা করতে হয়, এরাও করছে। কিছুকাল পরে হয়ত দেখব কলকাতা আর বাংলার কৃষ্টি সভ্যতার কেন্দ্র নয়, এটা শুধু তাদের যারা এদেশে আসলে যাযাবর আর শোষক। তারও মেয়াদ এক'শ বছর। তার আগেই হাত বদল হবে, না হলে এক'শ বছর পেরোবে না।

আলিনগরের খাল বেয়ে এখনও খড় বোঝাই নৌকা আসছে। মাল্লামাঝির একজনও কলকাতার নয় এমন কি বাংলারও নয়, খড়ের মালিক কৃষক নয়, খড়ের মালিক পাইকারের দল।

খালের দু'পাশে শহর জমে উঠেছে।

আলিনগরের সিরাজ মরল, কাশেমআলি পালাল, গুলি খেল জাফর মিঞা। বাংলা গেল রসাতলে। বাংলা বিহার ডুবল, ডুবল মারাঠা মোগল, সবই ইতিহাস। রয়ে গেল শুধু আলিনগরের খাল। এখন আর রইবে না। খাল ভরাট হয়েছে, ক্রীক রোতে মানুষের ঘেঞ্জি বসেছে। এবার বেলেঘাটা থেকে খাল বন্ধ করে দেবার আদেশ হয়েছে। খাল ভরাট কর। মারাঠা আর ইংরেজের সমাধি ঘটুক আলিনগরের খালে। কর্পোরেশনের গাড়ি বোঝাই দিয়ে ময়লা ঢালা সুরু হয়েছে। খাল এবার ভরাট হবে,। শহরের নতুন করে শোভা বৃদ্ধি হবে। ইতিহাসের শেষ পাতায় নতুন শহরের গতর বাড়ল।

শহর বসল পূর্বদিকে। অট্টালিকার শহর নয়। পাঁচ মেশালি। টালির বস্তি, টিনের দোতলা, ঢালাই ছাদ, পেটাই দালান, সব রয়েছে। শহরের সাথে সাথে কারখানাও বসেছে। ধুঁয়ো, কালি, পচা নর্দামা আর দুর্গন্ধ সম্বল করে ও পাড়ার মানুষের দল গায়ে গতরে বাড়ছে। ডেথ রেট খাতায় লেখা হয় না। ওরা, জানে, মরা মানুষ কথা বলে না। তাজা মানুষের কথা শোনাবার লোক নেই। দিব্যি নাকে তেল দিয়ে পৌরপিতারা নিদ্রা যান। শহর কোলকাতা মাঠ ময়দান চৌরঙ্গী চক চক করছে। বিকেল বেলায় মেলা বসে মেয়ে মরদের। কাপড় জামার প্রদর্শনী, ঠোঁটের রঙে আর গায়ের রঙে ঠেলাঠেলি! ঐতো আসল শহর। পূব পাড়ার মানুষ মাঝ পাড়ায় পা বাড়াতে সাহস পায় না, কাপড় কাচার পয়সা পায় না, পয়সা জুটলেও কাপড় জোটে না। দুটো জিনিষ এক সাথে এদের থাকা অপরাধ।

খাল ভরাট স্থুরু হয়েছে শেষ হয় নি।

খালের ঘোলা জলে জোয়ার ভাটা খেলছে। খেলুক। দুপাশের বাসিন্দা-রাও ভাসছে জোয়ার ভাটায়।

হাঁ বলতে গেলে বলতে হয় জিন্না সাহেবের হিম্মতকে। হিসশিম খাইয়ে দিল গোটা দেশকে। ইংরেজের এমন বশম্বদ ব্যক্তিটি ধর্ম দিয়ে জাতির পত্তন করল। খাস কোলকাতায় তাই বাঙ্গালী শুধু হিন্দু, মুসলমানের কোন শ্রেণী বা পংক্তি নেই। বাঙ্গালী মুসলমান নিজেকে বাঙ্গালী বলে না। আজব কাণ্ড। বাঙ্গালী আর মুসলমান-হিন্দু নয়। বাঙ্গালী উড়ে মেড়ো সবাই হিন্দু, মুসলমান শুধু মুসলমান। বাঙ্গালী না হওয়া দোষের নয়। জমির উপর দরদ নেই, দরদ নেই ভাষা ও কৃষ্টিতে তাই বাঙ্গালী মুসলমানের ছেলে নিজেকে বাঙ্গালী বলতে চায় না। এ শিক্ষা জিন্না সাহেব দিয়ে গেছে। এ হল খাস কোলকাতার কথা। ইরাকি মোছলমান আর ইরাণী মোছলমান এক জাতি নয়, বাঙ্গালী মোছলমান আর পাঠান মোছলমান এক জাতি। অর্থাৎ ধর্মই জাতিতত্ত্বের মেরুদণ্ড। দুতরফের এক বাত। আল্লাবাদে আর সব ফু-ফা। ভাষা,

শিক্ষা, কৃষ্টি এসব ধর্মের কাছে কিছুই নয়। তাই বলছি, জিন্না হল কায়েদে মরদ। নইলে ছোরা আর উর্দ্দি নিয়ে ভাইয়ের বুকের খুন চুষতে পারত কি কেউ।

এও ইতিহাস।

আলিনগরের খালের জলে তাজা লাল রক্তে এই ইতিহাস লেখা হয়েছিল। জমাট রক্ত এখনও ধুয়ে শেষ হয়নি। তাই ইতিহাসও মানুষ ভুলে যায় নি।

সব চেয়ে বড় ইতিহাস ইনুমিঞা আর চন্দরমাঝি।

ইনুর ইতিহাস জানে ছবীর চৌধুরী। আর চন্দরের ইতিহাস জানেন, না তার নাম বলব না। এখন সে মস্ত মানুষ। শেষে মানহানির দায়ে পড়ব নাকি। চন্দরের মুখেই শুনতে পাবে।

ছবীরের পা জড়িয়ে ইনু কেঁদে বলল, হুজুর চোখ খুলুন।

কেনরে?

কোলকাতার মানুষ গ্রামে পালাচ্ছে। তারা যদি গ্রামে খুন-খারাবি করে তাহলে আমার বুড়ো মা বাপ কোতল হবে।

ছবীর তেড়ে উঠে বলল, খুন দিয়েই পাকিস্তান হাসেল হবে, বুঝলি। তোর গাঁয়ে কে মরল আর না মরল তার হদিস করতে গেলে দুনিয়াতে পাকিস্তান হাসেল আর হবে না। পাকিস্তান হাসেল হলে দুনিয়ার মোছলমান আজাদী পাবে জানিস। আজাদীর মাশুল দিতে হয় খুন দিয়ে। খুন দিতে ডরাস যদি তা হলে বোরখা পরে পালিয়ে যা। তোর মত দু' দশ লাখ শহীদ না হলে আজাদী আসবে কেন, আল্লার রহম পাকিস্তানে কায়েম হবে কেন!

ইনু অত বোঝে না, বলল, জানিনা হুজুর। তবে যারা হাসেল করবে তারা যদি জবাই হয়ে যায় তাহলে হাসেলের কি দরকার।

যা, যা, ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস না। তোর পাড়ায় সব হেঁদু আছে না কোতল হয়েছে?

ইনু জবাব না দিয়ে ফিরে এল।

আর চন্দর! গৃহস্বামী হয়েও গৃহহীন, সম্বল শুধু শানিত ছুরি

হুজুরের চড়া মেজাজ। এম-এ পাশ করে দারোগাগিরি পছন্দ হচ্ছে না। লীগ রাজ্যে ফিফটি ফিফটি ব্যবস্থায় কায়েমী রাজ্যে আগুন লেগেছে। আই-এ পাশ মিঞা-দারোগার চোখ রাঙানী সহ্য হয় না। শোধ নেবার সুযোগ এসেছে আপনা থেকেই। তাই চন্দরের বড় কদর।

চন্দর ছুরি ধার দিয়ে গলির মুখে চুপ করে বসে থাকে। সুযোগ পেলেই পেছন থেকে বসিয়ে দেয় খ্যাচ্। বাড়ি গিয়ে কাঠকয়লা দিয়ে দেওয়ালে দাগ দেয়। এক-দুই-তিন হতে হতে শয়ের ধাক্কায় এসেছে।

কেমন চলছে চন্দর? হুজুর জিজ্ঞাসা করল।

আপনাদের দয়ায় মন্দ কি। তবে হুজুর পেট বাঁচানো চাইতো, বউ ছেলে রয়েছে।

তোর আবার বউ ছেলে ?

হেঁ হুজুর, সাত পাকের না হলেও ঘরকন্না করেতো। আর ছেলেগুলো আমারই। তাই একটু মায়া পড়েছে।

হুজুর দশটাকার নোট হাতে গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ইন্দুর পাড়াও মশগুল। সেকেন্দার আলি খাস ইরাণ মুলুকের লোক। খাস মোছলমান। ইস্কাপনী কোম্পানীর পেয়ারের লোক। সেকেন্দারের দলের কমসে কম দুশো মুরীদ ছুরিতে শান দিয়েই রয়েছে। হেঁদু পেলেই খ্যাচ্। সেকেন্দার আসে মাঝে মাঝে, ছুরি কিনবার পয়সা দেয়, মাঝে মাঝে নাস্তাপানির রসদ জোগায়। রুজি রোজগারের ধান্দা নেই, রয়েছে শুধু দল রাখবার উদয়াস্ত মেহনত।

ইস্কাপনী মিঞারা বলেছে, বাদশাহে বাদশাহে লড়াই হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। যারা শহীদ হয় তাদের মোবারকবাদ জানাবে বুঝলে। বংগাল মে পাকিস্তান কায়েম করনেই হোগা। দরকার হলে কলাবাগান আর লিচু বাগান থেকে লোক নিয়ে সাঁড়াশী আক্রমণ আরম্ভ কর। বন্দুক বারুদ আমরা দেব। সেকেন্দার তাজি-মোছলমান। কুর্দিস্তানের শুকনো পাহাড়ে তার উর্দ্ধতম দ্বাদশপুরুষ ভেড়া চড়াত। দ্বাদশপুরুষের বংশধর গয়া জেলা থেকে রিকসা টানতে এসেছিল শহর কোলকাতায়। এলেম না থাকলেও মগজ ছিল। পূর্বপুরুষের ভেড়া চরানো ঐতিহ্য ভুলতে পারেনি। কোলকাতায় ভেড়ার দল খুঁজতেও বেগ পায়নি সে। দু'দল ভেড়ার লড়াই লাগতেই

পশমের ব্যবসা ফেঁদে বসল। মেষ সংখ্যা না কমে যত বৃদ্ধি পায়, ততই সেকেন্দারের নসীব খোলে।

কটেজ ইনডাষ্ট্রির পত্তন হল সেই দিন। ঘরে ঘরে তৈরী হতে থাকে বোমা আর পটকা। লড়াই ফেরতা সৈন্যরা চোরাই বন্দুক পিস্তল জোগান দেয়। আর ইংরেজ দেয় হাততালি। বাহোবা জিন্না, বাহোবা কংগ্রেস। পিঠে এবার ভাগ হবে, কে পাবে কে জানে!

ইংরেজ ফরমান জারি করল।

মেরে প্যারো বাচ্চোঁ, তোমরা একটুকরা শুকনো রুটি নিয়ে কাড়াকাড়ি কর না। আমি ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিচ্ছি।

ডি-এল-রায়ের গানের ছন্দে দেশের লোক বলল, বাহোবা বাহোবা!

ওদিকে বর্মায় তখন পাততাড়ি গুটোতে হচ্ছে। সিংগাপুর আর মালয়ে কম্যুদের প্রবল বেগ, গ্রীসে গোলমাল, ইটালি যায় যায়। আর অর্ধেক জার্মানী সমেত পূর্ব ইউরোপ তখন কম্যু প্রশস্তি গাইছে। ইংরেজ দেখল মহাবিপদ। বশম্বদ ব্যক্তি চাই। ভাগ বাটোয়ারা ঠিক না করলে,কয়েকশত হাজার পাউণ্ডের কলকারখানা না বাঁচলে হাহাকার উঠবে নিজের দেশে। জাহাজী ফৌজের বাঙ্গালী ছোকরার দল কামান দাগছে বোম্বেতে। মহা বিপদ। ইংরেজ ডাকল, আও মেরা বাচ্চোঁ তোমাদের আজাদী দিচ্ছি। শুধু তোমাদের গলায় থাকবে লম্বা একটা দড়ি, দড়ির গোড়াটা থাকবে আমাদের হাতে দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে। দরকার হলে টানব, নইলে মনের সুখে দেশের লোকের দাড়ি ওপরাও। অন্তত কেউ বলবে না, ইংরেজ অত্যাচারী।

ইংরেজের বিউগিল বাজল। সভয়ে শুনল পাকিস্তান কায়েম হো-গিয়া। লেকিন!

লেকিন আবার কি?

কোলকাতা পাকিস্তানের নয় হিন্দুস্থানের।

হায় আল্লা, সেদিন কি জানত কেউ, কোলকাতা হিন্দুস্তানেরও নয় পাকিস্তানেরও নয়, কোলকাতা হল ঝুনঝুনিদের আর টুনটুনিদের। তখন কি জানত কেউ পুতুলনাচের উজির নাজিরের নাচের খরচ জোগায় যারা তারা লাইন দিয়ে দাঁড়াবে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে। আর সেই সাথে জৌলুস বৃদ্ধি পাবে ঝুনঝুনি আর টুনটুনিদের। সবই নসীব!

ইনুমিঞার বিবি খুব লায়েক মানুষ। সংবাদটা সেই আগে শুনেছে। রোস্তমমিঞা খবর দিয়েছে, পাকিস্তান হাসেল হয়েছে।

বস্তির মিঞা-বিবির দল জটলা করে জিজ্ঞাসা করল, তব কলকত্তা হামারা ?

নেহি। পুবিয়া বংগাল হামারা, কলকত্তা কাফের কো রহা গিয়া।

তাহালে ?

তাহলে আর কি, ঘটি বাটি জরু গরু সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়।

ইনুর কানেও খবর পৌঁছাল। ঘরে এসে দেখে বিবি বিছানা কাঁথা বাণ্ডিল বেঁধে তারাই প্রতীক্ষা করছে।

ইনু মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল।

বিবি জিজ্ঞাসা করল, শুয়ে রইলে যে ?

কি করব ?

পথ দেখ।

পথ বন্ধ, এখানেই থাকতে হবে।

হেঁদুরা জানে মারবে যে।

মারে মারবে, আমি তো কারুর জান মারিনি। খোদার গজব মাথায় নেব।

রাতের বেলায় বাজার থেকে ফিরে এসে ইনু ডাকল, রহিমা।

জবাব এলনা, ঘর খালি।

প্রতিবেশির ঘর খুঁজল। রহিমা নেই।

বিবি বাচ্চা নিয়ে রহমান সড়ে পড়েছে। কসাই বস্তীর দিলুর কাছে খবর পেল রহমানের সাথে রহিমা চলে গেছে, হেঁটেই তারা বাগদার মাঠ পেরিয়ে পাকিস্তান পৌঁছাবে।

ইনু চুপ করে বসে রইল।

সকাল বেলায় সেকেন্দার এসে তাড়া লাগাল।

কি মিঞা মুখ কালো করে বসে কেন ?

আল্লার গজব নেমেছে মিঞা।

তাইতো এলাম। যাবে নাকি পাকিস্তানে ?

না, তুমি যাবে ?

সোচতা হায় ?

হায় হায় করেই জীবন কাটবে। ইনু মিঞা পেটের দায়ে রয়ে গেল।

রইলেই হল!

পুলিসী তালাসী সুরু হল সারা বস্তীতে। বড় বড় মিঞা মোছল্লী তল্পী-তল্পা গুঁটিয়ে সরে পড়েছে। শান দেওয়া ছুরি আর বোমা পটকা খালের জলে ফেলে দিয়ে পালিয়েছে। নাম-করা খুনে লোকের পাত্তা কোথাও পাওয়া গেল না। যারা ছিল, তারা সকাল বেলায় সাদা টুপি মাথায় দিয়ে ন্যাস্যানালিষ্ট সেজে শান্তির বুলি আওড়ায়। তাতেও যাদের ভয় কাটল না, তারা ধুতি পাঞ্জাবী গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল আজাদী মিছিলে।

আলিনগরের খালের পশ্চিম দিকে কসাইখানার খোলা মাঠে ইনুমিঞা গালে হাত দিয়ে ভাবছে। তার সম্মুখ দিয়ে দল বেঁধে রেল ব্রিজের দিকে মিঞা-বিবির দল ছুটছে।

চন্দরও ভাবছে।

হুজুর তখন গোঁফে তেল দিয়ে পাকা লাঠির মত পাকিয়ে তুলেছে গোঁফজোড়া। এবার ধাপে ধাপে লাফ, লাফে লাফে নসীব।

চন্দর ডাকল, হুজুর।

কি খবর চন্দর?

আজ্ঞে শিকার তো সব পালাল, এবার কি করব?

হুজুর চিন্তায় পড়ল। কপালের রেখা কুঁচেকে বলল, মহাত্মার বাণী অহিংসা।

অহিংসায় চন্দরের পেট ভরে না। দু বছরে অনেক কামাই করেছে। এখন বেকার থাকলেও বেশিদিন বেকারি সহ্য হবে না। পেটতো আছে।

মিঞাপাড়ায় চন্দর ঢুকল জানুমিঞার খোঁজে। চন্দরের সমতুল্য ঐ একজন।

দুজনের গোপনে শলা পরামর্শ চলল।

চন্দর বলল, কিয়া বুঝতা হায় মিঞা, হাম হিন্দুও নেহি, মুসলমান ভি নেহি, আসলে আমি একটা মানুষ। দানাপানি চাই।

জানু একগাল হেসে বলল, হামার ভি তাই।

দানাপানি চাওয়া আর পাওয়ার মাঝে যে বিরাম তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবার মত রাস্তা তারা চেনে।

দুজনকে আর দেখা গেল না কয়েক দিন।

হুজুরের টনক নড়ল সবার আগে।

সাঁকোর মুখে রাহাজানি হয় নিত্য। হুজুরের ফৌজ বসে রয়েছে সামনে অথচ রুখতে পারছে না।

অবশেষে আবিষ্কার হল, চন্দর আর জান্নু।

কিরে চন্দর এই কাজ তোর?

কি করব হুজুর, আগে মোছলমান মারতাম, তাদের পকেটে কিছু পেতাম, দিন চলত, না চললে আপনারা চালিয়ে নিতেন। এখন রুজি রোজগার চাইতো। উপায় কোথায় বলুন।

হুজুরের মুখ থেকে কথা বের হল না।

জান্নু মিঞাও চন্দরের মতই সহজ সরল ভাষায় বেকার জীবনের তথ্য পেশ করল। হেসে বলল, আগাদের কি আর জাত ধর্ম আছে হুজুর, চোর গুণ্ডার কোন জাত নেই। বড় বড় মিঞারা হিন্দু কোতল করতে বলত, করতাম, দু পয়সা রোজগার হত। মোছনমানদের মত হিন্দুদের তো শুধু বদনা শানকি নিয়ে জীবন কাটেনা, তাই আয়টাও মন্দ হত না। এখন বেকার। কাজ চাই তো। এই ছবীর মিঞা ফিরিস্তি দিয়ে দিত, বুঝলেন।

ছবীর ততদিনে পাকিস্থান পাচার হয়ে গেছে।

যারা রয়েছে তাদের কোন রাস্তা নেই বলেই থেকে গেছে। আলিনগরের এপারের হাজতে বসে চন্দর জান্নু মিঞার হাত চেপে ধরে বলল, বড়ে দোস্ত্।

জান্নু লাফদিয়ে উঠে চন্দারর গালে গাল ঘষতে ঘষতে বলল, হ্যাম হায় একজাত এক ধরম কি বাচ্চা।

ইন্নু কাজে বের হয়।

রোজকার মত গলার সাথে মনোহারী দোকান ঝুলিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঝুনঝুনি আর ফানুষ বেচে বেড়ায়।

বস্তিতে ফিরেই শুনল, পাকিস্তানী হিন্দুর ভীড় জমেছে আলিনগরের খালের পূর্বচত্বরে।

কি হবে ?

ওরাও থকবে আমরাও থাকব।

ঘাউয়া কুকুর দেখেছিস, খ্যাঁক খ্যাঁক করে তেড়ে আসবে।

ততদিনে ঘা শুকিয়ে যাবে।

আলিনগরের পূর্বচত্বরে বস্তিতে আগুন লাগল।

জান্নুমিঞার লাস খালের জলে ভেসে উঠতেই সবাই শঙ্কিত হয়ে আরম্ভ করল দৌড়াদৌড়ি।

লাস ভাসতে ভাসতে বড় গাঙ্গে পৌছাঁবার আগেই জান্নু মিঞার বিবি এসে আশ্রায় নিল ইন্নুর কামরায়।

বলল, দেশে যাব।

কোথায় দেশ ?

ছোপড়া জিলা।

ছপ্পর যখন ভেঙ্গেছে তখন ছোপড়া গিয়ে কাজ নেই। দেখে শুনে কোথাও থেকে যাও।

হামারা বাপজান হ্যায়।

হায় তো অনেক কিছুই, কিন্তু আখেরে হায় হায় করতে হবে।

ক্যা করুঙ্গী।

নিকে টিকে করে কোথাও ঘর বাঁধ বিবি। যেখানেই যাবে হায়াত আর মৌত তোমার পেছু পেছু যাবে।

আমিনা ফিক্ করে হাসল।

অত তাড়াতাড়ি হেসনা বিবিসাহেবা, চালিশ দিন পেরোতে দাও।

চালিশ রোজ! অত দিন!

হাঁ, হাঁ, অত দিন। কোথাও থেকে যাও। আমাদের দিলু মিঞার বিবি মরেছে, সেখানে সুখে থাকবে।

আমিনা রসুই করতে বসল। ইন্নু বের হল তার সওদা নিয়ে।

রাতের বেলায় চুপি চুপি আমিনা এসে বসল ইন্নুর বিছানায়।

ইন্নু বাধা দিয়ে বলল, ইদ্দতকাল এখনও পেরোয়নি বিবি।

আমিনা হাসল। হাসি নয়, চকচকে তলোয়ার। খোঁচা বিঁধল হৃদ্ পিণ্ডের মাঝখানটায়।

তাড়াহুড়ো করে দলবেঁধে মানুষ ঢুকছে বড়, বড় বাড়িতে।

কোথা থেকে আসছেন গো ?

কুমিল্লা থন আইছি। আর আপনে ?

ও আর কইবেন না, মাদারীপুর।

কুমিল্লা, মাদারীপুর, বাগেরহাট, গাইবান্ধা, হরেক জেলার হরেক মানুষ নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলছে। খালি বাড়ি পেলেই ঢুকে পড়ছে।

ভাড়া !

ভাড়া কত দিমু ?

বাষট রুপয়া।

কও কি মাউরারপো। আমাগো দ্যাশে এর ভাড়া তিন ট্যাহা হইবো।

তব দেশ মে যাও।

গুস্‌সা হও কেন শেঠজি। রফা কইর‍্যা লও।

জমির মালিকানার সত্ত্ব বদলেছে। হাত বদল হয়েছে। যারা ছুটে এসেছে তারা তো জানে এও তাদের দেশ, যেটা ছেড়ে এসেছে সেটাও তাদের দেশ। ধীরে ধীরে বুঝল, ছেড়ে আসা দেশটা তাদের নয়, যেখানে এসেছে সেটাও তাদের নয়। সেখানে সংখ্যালঘু জিম্মি অথবা সন্দেহভাজন, এদেশে তারা ভিখারী।

বুঝতে সময় লাগেনি। অল্প দিনেই বুঝিয়ে দিল।অতিদরদী সরকার।

মাথায় হাত দিয়ে মহেন্দ্র বসে রয়েছে। হাঁড়িতে জল ফুটছে, চাল নাই।

আর বলবেন না মশাই, লাটের সম্পত্তি, পাকা বাড়ি, পুকুর, খাস চাষ সব ছেড়ে পালিয়ে এসে কি দুর্দ্দশা বলুন দিকি।

মহেন্দ্র সবার কাছেই এই কথা শোনে। সবাই ছিল জমিদার এখানে এসে হয়েছে ভিখারী। শুধু তারই কিছু ছিল না এখনও নেই।

সোনাতলার জমিদার রাখহরি আইচ। গামছায় ড্রাইডোলের চাল ডাল বেঁধে নিয়ে আসছিল। গোপাল ঘরামি নমস্কার দিয়ে বলল, কেমন আছেন কর্ত্তা ?

কে গোপাল নাকি ?

আজ্ঞে হাঁ।

ভালই আছি। তবু ভাল শেয়ালদহ ইস্‌টিশনে থাকতে হয় নি।

চক্রবর্তীদের মেয়ের নাকি বিয়ে ?

অজিত ভট্টাচার্য ছেলের নাম। কুলীনের বংশ।

বিয়ে হয়ে গেলে বউ নিয়ে অজিত এসে উঠল দক্ষিণ পাড়ার কোনায়।

মালতী জিজ্ঞাসা করল, কোথায় আনলে গো ?

শীগ্‌গীরই বুঝতে পারবে।

আজ কাল করতে করতে কুলীন বামুনের পরিচয় বেরিয়ে পড়ল।

কি সর্বনাশ, শুনলাম তুমি নাকি রজক ? মালতী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করল।

তাতে কি হয়েছে ?

ভাবছি, ঠকাতে পারলে না।

অর্থাৎ ?

আমরা হলাম হাড়ি।

অজিত চমকে উঠল।

মালতী কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ওসব ভেবনা। কত নমশূদ্র বামুন হয়ে গেছে হিন্দুস্থানে এসে, আমরা না হয় হাড়ি আর ধোপা।

চুপ চুপ। আজ আমার একজন বন্ধু আসবে তার খাবার ব্যবস্থা করবে। বুঝলে। এসব কথা কাওকে বলনা যেন।

পয়সা ?

তাও জোগাড় হয়েছে।

রাতের বেলায় সরবত খেয়ে মালতী ঝিমিয়ে পড়েছিল। সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই দেখে অজিত নেই, পাশে শুয়ে আছে অজিতের বন্ধু ননীলাল।

মালতী কাপড় চোপড় সামলে উঠতে যাচ্ছিল। হাত ধরে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ননীলাল বলল, রাতের বেলায় তো বেশ শুয়ে ছিলে এখন দৌড়াচ্ছ কেন ?

মালতী লজ্জায় ঘেন্নায় লাল হয়ে উঠেছে। লাফিয়ে পালাতে গিয়ে চৌকী থেকে ধপাস করে পড়ে গেল।

ননীলাল উঠে এসে তাকে টেনে তুলে শুইয়ে দিল বিছানায়।

অজিত বাজার থেকে ফিরছে অনেক কিছু হাতে করে।

মালতী চিৎকার করে উঠল।

কি হয়েছে বলনা ? অজিত যেন কিছুই জানে না।

সব শুনে গজরাতে গজরাতে বলল, এত বড় কথা। ননীলালের রক্ত যদি না দেখি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ননীলালের কথা শেষ করে অজিত বলল, আজ আমার পিসতুতো ভাই আসবে, একটু খাবার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

মালতী শুধু মাথা নাড়ল। রাতের ঘটনা তার মনে নেই, গ্লানিও নেই।

রাতের বেলায় আজও সরবত খেয়ে মালতী ঝিমিয়ে পড়ল। সকাল বেলায় ঘুম ভেঙ্গে দেখল অজিত নেই, তার পাশে শুয়ে আছে মাধব, যাকে পিসতুতো ভাই বলে পরিচয় দিয়েছিল অজিত নিজে।

মালতীর চোখের পর্দা ধীরে ধীরে সরে গেল।

তারপর !

তারপর একদিন দেখা গেল, কোন ঠিকুরিওলার সাথে মালতী নিরুদ্দেশ হয়েছে। অজিতও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। অনেক কামাই করেছে এই কয় মাসে। নতুন শিকারের সন্ধানে আবার বের হল অজিত ভট্টাচার্য।

ইনুর ঘরের পাশের ঘর ভাড়া নিয়েছে লটকন মিঞা।

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে দেখে আমিনা বিছানায় নেই। চুপে চুপে মশারি থেকে বাইরে এসেই দেখে ছাঁচা বেড়ার দেওয়ালের ফুটো দিয়ে আমিনা কি যেন দেখছে।

ইনুও চোখ দিল সেখানে।

লটকন মিঞার ঘরে অনেক লোক। কারুর মুখে কথা নেই। উনুন জলছে, রবারের চোঙ্ ভর্তি হচ্ছে। কেমন পচা গন্ধে বাতাস ভেপসে উঠেছে।

ইনু বোঝে। আমিনাকে আলগোছে টেনে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

আমিনা নাক সিঁটকে চুপি চুপি বলে, মশারিতে গন্ধ।

আমার গায়ে নয়তো? নসীব ভাল। গন্ধ নিয়েই কাটবে, বুঝলে বিবিজান। জান্নুমিঞা ছিল মহল্লার মোড়ল, খুসবাই ছিল বেশি। ইমু সেখের খাবার নেই, খুসবাই কোথায় পাবে।

আমিনার শরীর ভাল নেই।

কাজে মন বসে না, দেহ চলে না। কাঁথা শেলাই করে।

কি হল বিবিজান?

জানি না।

বুঝেছি, ওং-আ।

আমিনা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

অনেক রাতে আমিনা ডেকে তুলল ইমুকে। মাটিয়া কলেজ চলো।

দরজা খুলতেই সামনে পুলিশ।

আমিনার অবস্থা পেটের ব্যথা ভুলে যাবার মত।

পুলিশ।

তাইতো দেখছি।

লটকন মিঞার ঘর তালাসী নিচ্ছে।

মিঞা কোথায়?

পালিয়েছে।

পালালে কি রেহাই আছে। ঝগরু, এরফান আর মোতির মায়ের কোমরে দড়ি দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল পুলিশ।

আলিনগরের খালের ধারে ইংরেজের আদালত।

যখন ইংরেজ ছিল তখন আদালতের আদব ছিল।

এখনও বড়ই জম্ জমাট। সেদিনের চেয়ে আজকাল অতিথির সংখ্যা বেশী।

আদালতের দরজায় পা দেয় কার সাধ্য।

কি দরকার? কি চাই? এফিডেবিট? জামিন? মোক্তার চাই? উকিল?

মাথার চুলের গোছা বাঁচিয়ে দেউড়ি পেরোতেই কাল ঘাম ছোটে।

তারপর তো গুদাম।

ইংরেজের আদালত। আসামী তাদের ছিল বনমানুষ। তাই গুদাম ভর্তি করত। হালে সব বদল হলেও প্রভুর আইন বদল হয়নি।

মানুষকে বসতে হয়। পুরুষরা ছাদে বসে, উঠোনে বসে। মেয়েরা মান বাঁচিয়ে খাঁচায় বসে। দোতালায় কাঠের খাঁচায় জল জ্যান্ত মানুষ, চিড়িয়া খানার লাঙ্গুলধারী নয়।

হাকিম মুখ না তুলেই রায় লেখেন।

রাজবাড়ির লোক হাঁক ছাড়ে।

পিটি কেস।

অপরাধ?

রাস্তা নোংরা করেছে।

পাঁচ টাকা।

আসামী চিৎকার করে উঠল, না হুজুর মিথ্যা কথা। পাহারাওলা পয়সা চেয়েছিল, দেইনি বলে ধরে এনেছে।

দশ টাকা।

চুপ করে থাকলে অল্পে ফাঁড়া কাটে। কথা বলেছ না মরেছ।

এক ঘণ্টায় দেড়শ মানুষের ভাগ্য স্থির হয়ে গেল।

খোঁয়াড়ের জন্তুর মত সারি বেঁধে দাঁড়াও।

কি নাম?

জুম্মন।

তিন টাকা।

জুম্মন চমকে উঠল, সেকি বাবু। হুজুর বলল, দু টাকা।

হাঁরে হাঁ। জরিমানা দু টাকা, সেপাই চারআনা, রসিদ বাবু চার আনা আর পেস্কার আট আনা, বুঝলি।

জুম্মন খুব বুঝেছে।

রাতে ছুটছিল পীরের পানিপড়া আনতে। বউয়ের ভেদ বমি। পুলিশ পাকরাও করেছে। কৈফিয়েত শোনেনি। নগদ দক্ষিণা ছিল না, তাই রাত কাটল কম্বলে শুয়ে, সকালে শুকনো চিড়ে চিবিয়ে আসতে হয়েছে।

কি নাম ?

ভবতোষ দে।

ছ টাকা।

ভবতোষ খিচিয়ে উঠল, এক টাকা বুঝি ফাউ।

কেরাণী বুঝল, শক্ত মাটিতে পা ঠুকেছে। জিজ্ঞাসা করল ? কি কর বাপু ?

ফেরিওলা। রাস্তার হকার। আপনার মত বাবু মশায়ের ছেলে। এখন আর বাবু মশাই নিজে নই।

ওদিকে গাড়ি বারান্দার ছাদে জমেছে ভাল।

বাংলা দেশের অ-দিশী সেপাই। বাংলায় ঘর নয়। রপ্ত করেছে বাংলা দেশের সব কিছুই। বেতনের টাকায় হাত দেয় না জীবনে। রাস্তার মাসিক আর আদালতের ফাউ সব মিলিয়ে সুখেই থাকে। মাস কাবারে রুপায়া ভেজতা হ্যায়। হাকিমের ঝিমুনি আসলে সেপাইরা বিশ্রাম পায়। ছুটে আসে গাড়ি বারান্দার ছাদে। আসামীদের সাথে গাঁজা টানে। বিনা পয়সায় যা পায় তাই খেতে ওরা রাজি। যেমন করে হোক বংগাল থেকে রস চুষে নিতেই এসেছে, সে রসে গাঁজাই থাক আর মরফিয়াই থাক।

সাক্ষাত ধর্মাধিকরণের বুকের ওপর বসে গাঁজাটানা শুনতেও ভাল লাগে। বিশেষ করে উর্দিপড়া পুলিশ যখন পকেটমারদের সাথে বসে গাঁজা খায় তখন চোখ বুঁজে থাকলে ইন্দ্রের নৃত্যসভা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বেঁচে থাক দিশী সরকার। আর বেঁচে থাক হিন্দী ভাষা। বাহার যাইয়ে—পৈতৃক সম্পত্তি ওদের বেহাত না হয় সেদিকে লক্ষ্য। বাংলায় কথা বলে না, সবাই যা বুঝতে পারে না তাই ওরা বলে।

ডাক ছাড়ে, সোমরিশ্‌ ঘুষ্‌।

ঘুষ নয়, সোমরসও নয়। সমরেশ ঘোষ।

প্রভুরা এমন বশম্বদ ভৃত্য না পেলে কি বাঁচত !

চমৎকার ব্যবস্থা।

চকচকে আধুলিটা হাতে ফেলে দিলে সেলাম দেয়। কমতি হলে কথা বলে না। বললে বলে, বাহার যাইয়ে।

পেশকার পেশ করে। দেরী করলে মামলাবাজদের নরক গুলজার হয়, দক্ষিণাও জোটে।

আমার কেসটা? জিজ্ঞাসা করলে মুখে শব্দ জুয়ায় না, হাত এগিয়ে আসে টেবিলের তলা দিয়ে। দাও দক্ষিণা অবশ্য চুপে। হাকিমও জানে, হুকুমদাররাও জানে। নইলে পেশকার দেড়শ টাকার শাল গায়ে দেয় আর হাকিমের টাই কিনতে পয়সা ফুরোয় কেন! হাকিম চোখ বুজেই থাকে। সরকার আইনের প্যাঁচ খসাতে খসাতে এসব সৎলোকেরা দু তিন তলা বাড়ি তুলে ফেলে।

হাকিমদের সর্দি আর সারে না, নইলে গাঁজার গন্ধ নাকে পৌঁছায় না কেন! কানটা পাতলা হবার জো নেই। তুলো দিয়ে বসতে হয়। পাকাপোক্ত আসামী হাকিমকেও ধমকায়।

বিচার?

নিশ্চয় হয়।

বেচারি আসামী আর ফরিয়াদি (পুলিশ বাদে) মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ঘুরতে ঘুরতে হাল্লাক হয়ে চিৎকার করে, ছেড়ে দাও কেঁদে বাঁচি।

পেয়াদা চিৎকার করে, হাজের হ্যায়।

আসামীর গলায় টনসিল বেড়ে গেছে, ঘোঁত ঘোঁত শব্দ বের হয়। ঘটি বাটি হাজিরা দিতে দিতে শেষ হয়েছে। কথা বলার জোস আর নেই।

ফরিয়াদি চিৎকার করে, কিল খেয়ে কিল চুরি করাই ছিল ভাল।

হাকিমের দোষ কি। ডাইরি খুলুন। সাতচল্লিশটা কেশ একদিনে, না হলেও বিশটা।

মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে পাঁচটা মামলা যে হাকিম শোনে সেতো আধা ভগবান। বিশটা কেস হলে পুরো ভগবান হতে হয়।

তাহলে তারিখ দিন হুজুর।

উকিল বাবুতো তাই চায়। পুলিশ কোর্টে একবার যখন এসেছে বাছা তখন তারিখে তারিখে বুকের আধপোয়া রক্ত মোক্ষন না হয়ে যায়। সে আসামীই হোক আর ফরিয়াদিই হোক। মস্ত সাইকোলজি, এই সাইকোলজির পাল্লায় সাইলকের দল হামাগুড়ি দিতে দিতে একে বারে চারতালার ছাদে উঠে পড়ে।

ছাদের ছায়া পড়ে আলিনগরের খালে।

আলিবর্দীর আদুরে নাতি দাদুর নামে নাম রেখেছিল এই শহরের।

আলিবর্দী ভাগ্যি বেঁচে নেই, নইলে সরফরাজকে কোতল করবার দায়ে যদি এসে দাঁড়াত এই বিচারশালায় তাহলে সেও ডুকরে কাঁদত, নেহি মাংতা নবাবী।

ইংরেজর আদালতে দেশী মানুষের ভীড়।

ভীড় ঠেলে এসে যারা দাঁড়ায়, ছয় ঘণ্টায় তাদের চেহারা বদলায়।

ওপাশে মানুষ মারার কারখানা। বাঁচেও নাকি কেউ কেউ।

লোকে বলে পাতাল।

যারা আসে তারা উপদেশ পায় আর স্টক মিকশ্চার খেয়ে পরলোকের দিন গোনে।

দেড় হাজার রুগীর তিনজন ডাক্তার। গড়ে পাঁচশোতে একজন। রোগীও খুব ভাল। আট ঘণ্টার ভগ্নাংশ আধ মিনিটে চিকিৎসা শেষ করতে করতে ডাক্তার আর ডাক্তার থাকে না, হাতুড়ে হয়ে যায়।

বের কর জিব। দেখি নাড়ী। জ্বর হয়? আচ্ছা।

খস্ খস্ খস্। কাগজে কালির দাগ পড়ল। মিস্ট কিউ ওয়ান আউন্স টি ডি।

নেক্স্ট।

আবার খস্ খস্ খস্।

অনেক দিন হল জ্বর ছাড়ে না ডাক্তার বাবু।

এই ওষুধটা কিনে খাও। সামনের ঐযে বিনোদিনী ড্রাগিষ্ট, ওখানে পাবে।

এবার সরকার বাঁচল আর বাঁচল কর্পোরেশন। স্টক মিকশ্চারের বোতলে সরকারী কিউ আর কর্পোরেশনের জল মজুত থাকল। লোকে বলে 'বিনোদিনী ড্রাগিষ্টে'র সাথে পারসেণ্টেজ রয়েছে।

শক্ত লোক শক্ত কথাও বলে।

বুঝলেন ডাক্তার বাবু আপনারা হচ্ছেন ইংরেজ কোম্পানীর দালাল।

মানে?

মানে সহজ। ইংরেজ কোম্পানী ওষুধ চালু করবে কালো মানুষের দেশে।

তারা সুপারিশ ধরল মাথা মোটা ডাক্তারকে। কিছু প্রাপ্য যোগ অবশ্যই থাকে। মাথা মোটা ডাক্তার লিখে দিল ওষুধের নাম। তাতে সারল কি মরল তার ঠিকানা অনেকেই করেনা, কিন্তু মাথা মোটার শিষ্যসাবুদ অনবরত লিখতে থাকে সেই ওষুধ। জাননা হে আমাদের ডাক্তার বিশোয়াস রেকমেণ্ড করেছে। চালু হয়ে গেল ওষুধ। কমিশন পায় মাথামোটা বিশোয়াস, ওষুধ না খেয়ে যারা মরত, খেয়ে তারা তাড়াতাড়ি মরছে।

নতুন হাউস সার্জেন অত বোঝে না। মুখ নীচু করে খস্ খস্ করে প্রেস্-কিপসান লেখে।

রুগীতো ইন ডোরে দিতে হবে?

সে আপনার দয়া।

কিন্তু সিট নেই।

তা হলে।

একবার সার্জেনের কাছে যাও। এখানে নয়, তার চেম্বারে। সাত নম্বর ফড়িংহাটা লেন। ফি-টা দিও কিন্তু।

ইন ডোরে জায়গা চাই।

চাইবার সাথে সাথে ফড়িংহাটার সার্জেনের পকেটে মোটা দক্ষিণা গুঁজে দাও। বাস। তারপর? দু দিনেই সিট খালি।

বেশ বেশ।

মানুষ মারার কারখানায় আছে সবাই সুখে কি বল?

আমাদের নগাদা বলত, কৈ হে, তোমাদের সেই চায়না না আর্ণিকা আছে নাকি? দাও দেখি চায়না ফিফটি, আর্ণিকা সিকসটি, পালসেটিলা নাইনটি, ভাল করে এমালসান করে দাও। বাড়ির টিউবওয়েলে দিয়ে রাখব, ডাইলুশ্যান বৃদ্ধি পাবে। চুমুকে চুমুকে ওষুধ খেলে কোন রোগই হবে না। তোমাদের ঐ মানুষ মারার কারখানার চেয়ে এও অনেক ভাল।

পাতালটা রাজা বাদশার স্থান হে, রাজা বাদশার স্থান। তোমার মত চুনো পুঁটি শুঁটকি মাছের মত চেপটে যাবে ওখানে।

সে কি নগাদা, হাসপাতাল তো গরীবের জায়গা।

কাগজে কলমে। ওসব তোরা বুঝবি না। পাতালে পাকা ইটের বাড়ি থাকে, দরকার অদরকারে দু একজন ডাক্তার নার্স থাকে, আসলে ওষুধ

থাকে না। অর্থাৎ যেটার দরকার সেটাই পাবে না। গাঁটের কড়ি ফেলে তেল মাখতে হয় এখানে। তাও ছিল ভাল। এর আবার ক্লাইমাক্স রয়েছে ভাই, সেটা তোরা বুঝবি না। একবার আমাদের তারকবাবুর ভাগ্নের কলেরা হয়েছিল। বেচারাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে তারকবাবুর আর ঘুম হয় না। এক দিন, দু দিন, তিন দিনের দিন গেটের লিষ্টে দেখা গেল বাইশ নম্বরের রুগী পটল তুলেছে। বাইশ নম্বর? অর্থাৎ তারকবাবুর ভাগ্নে। খাটিয়া কিনে আনলাম, হাড়িকুড়ি যা দরকার, এমন কি তিল আতপ চাল অবধি। সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে গেলাম মর্গে। বাইশ নম্বরের ঢাকনা তুলে তারক-বাবু তো অবাক। বলল, ওরে নগা, এতো আমার ভাগ্নে নয়। বললাম, সেকি? খোঁজ সুরু হল। কলিকালে ভূত হওয়া আশ্চর্য নয়। সবচেয়ে বড় ভূত ডাক্তার, তার ঘাড়ে চাপলাম। শেষে দেখা গেল, বাইশের 'এ' বেডে যে ছিল সে স্থান বদল করেছিল বাইশ নম্বরে, সেই শেষ অবধি পটল তুলেছে। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে। এই আর কি। জানিস তো আমরা সাংবাদিক। এরকম কত খবর শুনি আর দেখি তার শেষ নেই।

নগাদা সত্যি কি মিথ্যে বলে তা জানে ভুক্তভোগী। আমরা জানি, চিকিৎসা মানেই পকেট খালি। যার পকেট শূন্য তার পরমায়ুর ঘরেও শূন্য। খেদ থাকলেও খেদোক্তি নেই।

ইঁটের ওপর ইঁট চাপিয়ে অট্টালিকা তৈরী হয়, লোহার খাটিয়া, ছোবরার গদি আসে। ঠিকাদাররা ঠিক সময়ে সেলামি দিয়ে বিলের টাকা ব্যাঙ্কে রাখে। সব ঘড়ির কাঁটায় হয়ে চলেছে, শুধু ঘড়িতে বারটা বেজে আর সময় এগোচ্ছে না রুগ্ন মানুষের বেলায়।

চন্দর মাঝিও আজকাল সেই কথা বলে।

টেইম আর কাটে না বাবু।

তা বটে। এ যেন ডিসেম্বরের রাত। সকাল আর হতে চায় না। মেয়াদি আসামী চন্দর মাঝি। রাহাজানির দায়ে সাত বছর মেয়াদ হয়েছে।

আসবার সময় হুজুরের সাথে দেখা হয়নি।

হরিণবাড়িতে হঠাৎ দেখা হতেই চন্দর কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, সবাই কাজ করিয়ে নেয় বাবু, কিন্তু কেউ কাজের ঝক্কি সয় না।

কথাটা যেন বুঝতে পারিনি এমনি ভাবে বললাম, কি হল চন্দর ?

কি আর হবে। এয়েছিল নিতাইয়ের মা, (চন্দরের পরিবার—সাত পাকের বউ নয়) বললে, বাবুদের কথা না শুনলেই পারতি। আগে পকেট কাটতি, দু একমাস মেয়াদ হত আবার ঘর সংসার পেতি। বাবুদের কথায় হাত পাকিয়ে দেখ কেমন মজা। সত্যি বলছি, আমি তো এমন ছিলাম না। হুজুর বলল, মোছলমান সাবরে দে। আমি আছি, কেউ গায়ে হাতও দেবে না। সাবরাতে সাবরাতে নিজেই সাবরে গেছি। হাত পাকলে নিস্-পিস্ করে।

চন্দর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কি ভাবছ চন্দর ?

পেতাম যদি হুজুরকে একবার !

চন্দরের চেহারা বদলে গেল।

উঠে এলাম।

নিতাইয়ের মা কি আর সাত বছর ঘরকরা মানুষের প্রতীক্ষা করবে। খোঁজ নেবার সুযোগ পাইনি। সুযোগ পেলেও সুখের হতনা।

কানের কাছে বেজে উঠল, এক্-দো-তিন।

তিন। তারপর চার। তারপর।

থাকগে।

লাল্টুরাম বলত, সে কথা শুনলে হাসবেন হুজুর। লছমনিয়া দরদরিয়া গাঁয়ের জিমিন্দার। কোলকাতায় ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সপরিবারে বসবাস করতে এসেছে। দু খানা ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম আর পায়খানা। ছোট্ট ফ্ল্যাট। বাড়ি দেখে লছমনিয়া ভারি খুসী। তিনঠো কামরা আর রসুইখানা। বললাম, তিনঠো নেহি, দোঠো। পায়খানা দেখিয়ে বলল, উস্‌মে চৌকা হ্যায় উস্‌মে রসুই হোগা। হায় ভগবান। খাজা গেঁয়ো লোক, সাইফুন প্যানকে উমুন মনে করে আনন্দে নাচছে। ভাগ্যি লকড়ি জ্বেলে রান্না সুরু করেনি।

বললাম, কি সব বলিস।

সাচ্ বাত বাবুজি। সাচা কথা সব সময় মিঠা হয় না বাবু। তাইতো লাণ্টুকে লোকে দেখতে পারে না।

লাণ্টু বাগানের কাজে বেরিয়ে গেল।

রাত কটা বাজে? এগারটা।

ওঃ বাবা, এ যে সহাবস্থান। পঞ্চশীল দেখছি কোলকাতার ফুটপাতে ধন্বি ধন্বি রব ছাড়ছে।

ঝরঝরিয়ামল সাগরলালের গাড়ি বারান্দায় পা থেকে মাথা অবধি ঢেকে একপাল মানুষ গড়াচ্ছে। শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত দোতালায় ঝরঝরিয়ামল রেডিওতে গান শুনেছ। এদেশের গান নয় বিদেশের। নীচের মানুষের গা ঘেঁষে একজোড়া ধর্মের ষাঁড় আর নেড়ি কুকুর জড়াজড়ি করে শুয়ে রয়েছে। এমন সহাবস্থান কেউ দেখেছে কি কখনও? মহারাজ অশোকও বোধহয় এতটা কখনও ভাবেনি।

আরে বাপু, লচ্ছিবিবির নাকি আবার ছেলে হবে।

মানে?

মানে আবার কি ঝরঝরিয়ামলের গাড়ি বারান্দায় বাস করলে কি সন্তান হওয়া অপরাধ। ঝরঝরিয়ামলের ঔরৎ পি-জিতে যাচ্ছে, নেড়ি কুকুর ডাস্টবিনের কোনায় সংসার পেতেছে, ষণ্ড দুটো সঙ্গী খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর লচ্ছিবিবির ছেলে হবে না! সহাবস্থানের যুগে এ না হয়ে যায় কোথায়! সহাবস্থানের সাথে রয়েছে শ্বেত কপোত। শান্তি, ওঁ শান্তি।

সকাল বেলায় কাঁথা আর চট জড়িয়ে যে যার বগল দাবা করে বেরিয়ে পড়ল।

দলের লীডার রয়েছে।

একপাল ছেলে নিয়ে লচ্ছিবিবি পথ চলতে পারে না।

হুরমুত বলল, একটা ছেলেকে দে লচ্ছি।

ছয় আনা দিতে হবে। একদিনের ভাড়া।

হুরমুত রাজি হয়ে লচ্ছির ছ বছরের ছেলের হাত ধরে এসে দাঁড়াল গৃহস্থ বাড়ির চত্বরে।

মা-হারা ছেলেটাকে দুটো খেতে দিন মা। হুরমুতের চিৎকার বৃথাই যায় না। যা পায় তাতে ছয় আনা ভাড়া দিয়েও উপরি থেকে যায়।

নটবর চালাক লোক।

সকাল হলেই গঙ্গার ঘাটে যায়। উৎকলী বামুনদের ডজন ডজন সিঁদুর মাখানো ঠাকুর রয়েছে। কেউ শেতলা, কেউ সত্যনারায়ণ। নটবরের রোজানো বন্দোবস্ত। সোয়া আট আনা ভাড়া। সকাল সাতটা থেকে বেলা তিনটে অবধি।

নটবর ঘণ্টা হাতে বেরিয়ে পড়ে।

মা শেতলার দক্ষিণা পাই মা।

আজকাল আর পাকা বাড়ির বাসিন্দারা পয়সা দিতে চায় না। বস্তিতেই বেশি ঘুরতে হয়।

লচ্ছিবিবি ভাল করেই বুঝেছে, কোলের ছেলেটা নিয়ে ছেড়া থান পড়ে বের হলে উপার্জ্জনটা ভাল হয়।

এই তো সাতদিন হল। সোয়ামি মরে পথে বসিয়েছে মা। কচিকাচাটা নিয়ে কি যে বিপদ। ছেরাদ্দটাও যে হয় না।

এ ব্যবসা একপাড়ায় দু চার দিনের বেশি চলে না। পাড়া বদল হয় হপ্তায় হপ্তায়।

সন্ধ্যার আঁধার জমতে না জমতে সবাই ফিরে আসে ঝরঝরিয়ামল সাগরলালের গাড়ি বারান্দার তলায়। যে যার প্রাপ্য গণ্ডা বুঝে নেয়, কোন অভিযোগ নেই। অপার শান্তি। শ্বেত কপোত পাখা গুটিয়ে আশ্রয় নেয় ওদের কাঁথা আর চটের তলায়।

চমরুকে ধরে নিয়ে গেছে।

কে ?

পুলিশ।

কেন ? প্রশ্ন কর্তা অনেকেই। শ্বেত কপোতের ডানা বুঝি ভাঙ্গল।

শুনলাম, চোরাই মাল পাচার করেছে।

সুখে থাকবে। মন্তব্য করে কোরাসে ফিস ফিস্ করে।

সব চুপ চাপ।

রাস্তায় ট্রাম বাস বন্ধ। রাস্তায় লোক দেখা যায় না।

ঝণ্টুরাম পাশ ফিরে শোয়।

রুকমানিয়া হাঁই তোলে।

গ্যারেজের পেছনটায় অন্ধকার।

ক্যোন হ্যায়? পাহারাওলা হাঁকে।

পিসাব করনে গিয়া। হাম কাঙ্গালী লোক।

পাহারাওলা লম্বা লাঠির মাথায় হেলান দিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়। নেড়ি কুত্তার দল মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয়।

পাহারাওলা চোখ বুঁজেই হাঁক দেয়, কোন হ্যায়।

টুং-টুং-টুং।

রিকসার আওয়াজ। অনেক রাতে বাড়ি ফিরছে কাপ্তানের জুটি।

পাহারাওলা রিকসা থামায়। এবার ঘুম ভেঙ্গেছে, হাত বাড়াল, চক্ চকে নিকেল খণ্ড তুলে নিয়ে আবার লাঠিতে হেলান দিয়ে ঘুমোয়।

টুং-টুং-টুং। কাপ্তেনের রিকসা গলি পেরিয়ে যায়।

লোকনাথ একবার লোক গুনতি করতে গিয়ে ফিটের ব্যামোতে ভুগেছে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, ফিট্! ফিট্ যে ফাট হয়নি তাই ভাগ্যি। উত্তর থেকে দক্ষিণ অবধি আট মাইলে চল্লিশ হাজার কেয়ার অব্ ফুটপাত। ঠিক মানুষ বলা যায় না, তবে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য সবই রয়েছে ওদের। নইলে, থাক সে কথা আর তোদের বলতে চাই না।

নগাদা বলে, ওরাই আসল গণতন্ত্রী। কিন্তু নগাদাই একদিন বলল, ওদের মধ্যে নন্ এ্যাগ্রেশন প্যাকট্ রয়েছে হে, একেবারে পঞ্চশীলের একশীল। লচ্ছিবিবির কাছে ঝণ্টুরামের যা দাম, ঝণ্টুরামের কাছে রুকমানিয়ারও সেই দাম। প্রাচীন পৃথিবীতে সাম্যবাদ ছিল। তোমরা বলে থাকো, প্রিমিটিভ

কমুনিজম, বর্তমান যুগে ঐ কমুনিজম রয়েছে ওদের। এই কমুনিজমের মূল মন্ত্র গণতন্ত্র। কেউ কারুর নয়, আবার সবাই সবার। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য রয়েছে আবার সামগ্রিক ব্যবস্থাও রয়েছে। বুঝলে!

নগাদার কথা শেষ না হতেই নির্মল লাফিয়ে উঠল।

লাফাচ্ছিস কেন?

দেখছনা পাগলটা কেমন করছে।

তাই বল। ও না হয় পাগল, তা বলে তুই তো উদয়শঙ্কর নোস্। নাচানাচিটা রাস্তাঘাটে করিস না। করলে, লোক মনে করবে তোরও বুঝি মাথা খারাপ।

নির্মল থমকে গেল।

খারাপ মাথার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে করতে বিজ্ঞানবিদ্‌রা হয়রাণ হয়ে গেছে। জবাব খুঁজে পায় নি। কদম ফেলতে দশ কদমে একজন পাগল। ভাল করে চোখ খুললে পলকে পলকে পাগল।

নগাদা বলে, তোমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক সেও একটা পাগল।

তা হলে পড়ায় কেমন করে?

এ হল ভাবের পাগল। সব পাগল তো এক নয়। দেখতে পাস না, রাস্তা দিয়ে বিড়-বিড় করতে করতে যায় অনেকে, অনেকে হাসতে হাসতে যায়, ওরাও কমবেশি পাগল। আমাদের মুখুজ্যেমশাই সেই রকম পাগল, বুঝলি!

বুঝতে পারিনি।

বুঝবে কেমন করে বলতে পার। নীহারবাবুকে বেশ দেখছি চলা ফেরা করতে অথচ গতকাল শুনলাম তার মাথা খারাপ হয়েছে।

খোঁজ নিতে গিয়ে ফিরে এলাম। রাস্তাতেই শুনলাম, গত কয়েক মাসে বেকার নীহারবাবু কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। তারপর? বাস্।

নীহারবাবু নাকি কোন ষড়যন্ত্রের মামলায় দশ বছর কয়েদ ছিল। তখন তো মাথা খারাপ হয় নি! এখন হঠাৎ কেন হল।

অনেক সময়ই নীহারবাবু বলত, দেশ স্বাধীন হলে আমাদের ভাতের জন্য সেদিন আর ফেউ ফেউ করে বেড়াতে হবে না।

স্বাধীন হবার আগে তাকে ফেউ ফেউ করে বেড়াতে হয় নি। স্বাধীন হবার পরই ফেউ ফেউ করে বেড়াতে আরম্ভ করে নীহারবাবুর স্বপ্ন ছুটে গেল।

একটা চাকরি দেবে ভাই।

ভাই! সর্বনাশ!

দ্রোন-দ্রুপদের কথা ভুলে গেছ। সমানে সমানে বন্ধুত্ব আর ভ্রাতৃত্ব। যখন বন্ধু ছিলাম তখন ভাই ছিলাম আর তখন একই লোহার সানকিতে ভাত খেয়েছি। আর এখন? সমানে সমানে সব সাজে, বুঝলে।

নীহারবাবু বুঝল, ভাল করে বুঝল।

আরও বেশি বুঝল, যখন তিন্তীরিওলা উচ্ছেদের মামলা করল।

নীহারবাবু জবাব দিল।

আমি বাস্তহারা।

উত্তর পেল, নিজের বাস্ত নেই বলে অপরকে উদ্বাস্ত করবে নাকি।

আমি কর্মহীন।

উত্তর পেল, তা হলে এ জীবনে তুমি ভাড়া দিতে পারবে না।

কর্মদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব, বাস্তদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

উত্তর পেল, সে দায়িত্ব আদালতের নয়।

অতএব উচ্ছেদ।

তিন্তীরিওলা ইংরেজের যুদ্ধ ফণ্ডে তিন লক্ষ টাকা দিয়েছে, দেশ স্বাধীন হবার পর ভোট যুদ্ধে এক লাখ রূপেয়া দিয়েছে। চাউল চিনিকা পারমিট পেয়েছে। আর নীহার চক্রবর্তী, তুমি তো মাত্র দশ বছর জেল খেটেছ। তোমার দাবী আর তিন্তীরীওলার দাবী কি এক হতে পারে। ছোঃ। জয় তিন্তীরিওলার জয়।

আর নীহারবাবু সপরিবারে কেয়ার অব ফুটপাত।

তারপর?

ওকথা আর বলিস না ভাই। নীহারবাবু পাগল হয়ে গেছে।

আর খোঁজ নেওয়া হয়নি। একটা খোঁজ পেয়েছিলাম। সত্যি মিথ্যা জানি না।

স্বদেশীবাবুদের আদালতে একমাত্র কোলকাতায় নাকি আড়াই হাজার তিন হাজার উচ্ছেদের মামলা বছর বছর হয়ে থাকে।

তা পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের শহরে পঞ্চাশ হাজার লোক ফুটপাতে বাস করে আর আড়াই হাজার পরিবারের পনের হাজার লোক বছরে উচ্ছেদ হয়। এ আর এমন কি বেশি সংখ্যা। এই মানুষগুলোর মাথা গুঁজবার মত জায়গা

দেবার আইন যখন নেই তখন তাদের পথে বসাবার আইন কেন থাকবে না। ম্যাফারমেটিভ না থাকলেও নেগেটিভ থাকবেই। এই নাকি জ্যামিতিক নিয়ম।

তবে রঞ্জনা নাকি পাগল হয়েছে অন্য কারণে।

সেটা উহ্য থাকুক।

পণের টাকা দেবার সাধ্য না থাকলে মেয়ের জন্ম দেওয়া ভারতবর্ষে অপরাধ। তাও যদি আগের মত পুরুষ প্রতি গড়ে তিনটে করে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকত তা হলে পণের ধাক্কা অনেকটা কমত। তা আর হল কই।

নগাদা বলে, মোছলমানরাই ভাল। স্বাধীন দেশের পুষ্যিপুত্তুর। ওদের চার বিবি, তাই আইন; আর হিঁদুর বেলায় দুই বিবি, তাই বে-আইন। এ তোমার কেমন ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হে বাপু। এই ব্যবস্থা আছে বলেই মোছলমানদের পণের বালাই নেই, মোহরানার শক্ত কব্জা রয়েছে। আর আমাদের? আর বলনা। আইন হচ্ছে, পণ নিওনা। তবে ইচ্ছে করে দিলে তাতে দোষ নেই। বল দেখি, মেয়ে জামাইকে হাজতে পাঠাতে কোন বেল্লিক বলবে যে অনিচ্ছায় পণ দিয়েছি। হাঁ মাথা বটে। যারা আইন করে তাদেরও মাথা রয়েছে আর আইন যাদের মাথায় লোহার পেরেক বসায় তাদেরও মাথা রয়েছে। বুঝলি। রঞ্জনা ভালবেসেও স্বামী পায়নি, তাই মাথা বিগড়েছে, লোকে বলছে, পাগল।

নগাদা বুঝিয়ে শেষ করেছে।

বললাম, নগাদা, এসব কথা আপনার কাগজে লিখে দিননা।

জিব কেটে নগাদা বলল, পাগল হয়েছিস। বুড়ো বয়সে কি বউ ছেলে নিয়ে না খেয়ে মরব। জানিসতো, আমাদের নাম ধাম যাই কাগজে থাকুক না কেন, কাগজের আসল মালিক স্বয়ং রাণা প্রতাপসিংহের দেশের লোক। ওরা ছেলের বিয়ে দেয় দাঁও মারতে, সেখানে হাত দিলেই চাকরি নট্।

নগাদা পাশ কাটাল।

আলিনগরের খালের দুপাশে শহর বসেছে। করাত কলের করাতের মত

নানা সাইজের মানুষ কেটে বের করছে শহরের ইঁট কাঠ পাথর ভর্তি প্রাণহীন ভব্যতা।

ওরে বাপু আমি তুমি একই।

চমকে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। ভব্যতার নিদর্শন চোখের সামনে।

শুধু ভোটটা আমাকে দিও।

বুঝলাম।

ইস্ত্রি ভাঙ্গা জামা কাপড় আর কয়লা ডিপোর মালকোঁচা তাই বুঝি একই।

এমন ভব্যতা সহজলভ্য নয়।

তবু দাদা-দিদিদের ভাল না বাসলে চলে না।

যেমন দাদা তেমনি দিদি।

শ্রেণী আছে।

দাদা ও দিদির শ্রেণী নয়। কৌলীণ্যের।

দাদারা যেমন দিদিরাও তেমন। কেউ হাজারী মনসবদার, কেউ শত্‌কী মনসবদার। বাইশ বছরের নেপাল তেপান্ন বছরের রাসমনির দাদা। উনিশ বছরের নিরুদি সবার দিদি। খাঁটি গণতন্ত্রের যুগের ভব্যতা। সমতা আনতে হলে জিবের সমতা আগে আনা চাই তারই রিহিয়ারসেল দিচ্ছে দাদা-দিদির দল।

এটা হল বেসরকারী ব্যবস্থা। সরকারী ব্যবস্থা ক্রমশ প্রকাশ্য।

কিন্তু দাদা দিদিদের কৌলীণ্যের মর্যাদা কেউ ভোলেনি।

ডুয়েল ফাইটের আঙ্গিনায় দিদিরা রয়েছে, দাদারা থাকে অনেকটা দূরে। সেখানে দাদা দিদিরা আলাদা নয়। সরকারী অতিথিশালায় জাতি গঠনের দায়িত্ব নিয়ে ওরা বাস করছে। যতদিন পাঠশালায় থাকে ততদিন কেমন যেন গদগদ ভাব। পরের পাঠশালা ছেড়ে নিজের পাঠশালায় এসে চেহারা পাল্টে যায়।

এক বছর যা শিখে এলি তার নমুনা কোথায়।

শেখাটা শেখার জন্য, শেখাবার জন্য নয়। আয়ের অঙ্কটা বৃদ্ধি পেয়েছে, এইতো লাভ। শিখিয়ে দিলে আমার থাকবে কি বলতে পারিস ? বিদ্যেটা জমে থাকুক। জমতে জমতে যখন উপচে পড়বে তখন ছিটেফোঁটা দিয়ে যাব বুঝলি। তার চেয়ে ভাল কথা শোন।

এর চেয়ে ভাল কথা ?

আরে হাঁ, হাঁ। বনে উপবনে দাদারা আর দাদা থাকে না, দিদিরাও দিদি হতে চায় না। শাঁখা সিঁদুরে বড়ই তাদের লোভ। তারপর তিন টাকা। সবাইকে কদলী প্রদর্শন করে রেজিস্টারের খাতায় নাম সহি দিয়ে দু জনে দু কাপ চা খেয়ে প্রথম মাসের মাইনেতে বিছানা কিনতে বের হয়।

কোলকাতা বড় নীরস শহর। দাদা দিদি যখন সিঁদুর কিনে বের হয় তখন বাড়িওলাদের অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। শ টাকার কমে বিছানা পাতার মত ভূমি সংগ্রহ হয় না। তা হোক, ওরা সুখেই থাকে।

এদের চেয়েও সরস লোক লালদিঘীর চত্বরে কম দেখতে পাবে না। প্যাণ্ট-কোট ছেড়ে দিদিরা সমমেজাজের অংশীদার হয়েই কুকারের কয়লা জ্বালায়। ওরা যা বোঝে অন্যকে তা বুঝিয়ে দিতে চায় না। সরকারী ব্যবস্থায় পণ প্রথার হাঙ্গামা নেই। সুবিধা মত রশারশির টানাটানি জুড়ে দেয়। দেখতে ভাল, শুনতে ভাল, সবই ভাল। মন্দ শুধু একটা। অন্য দাদা দিদিরা নরম মেজাজে চলে, লালদিঘীর চত্বরে মেজাজ গরমের দল, সেখানে উভয় পক্ষই ব্যাটন হাতে ঘোরে, বুঝতে ভুল হয় কোনটা পুরুষ আর কোনটা নারী।

তার চেয়ে সরেস গল্প বলছিল কুলেন্দু। মহাকরণের মহান কর্মী। মাঝে মাঝে দেখা হয়। আপ্যায়নের শেষ নেই।

আর বলিস না ভাই, কাজতো কচু। ষোল মাস না পেরোলে যদি চিঠির জবাব দেওয়া হয় তা হলে বয়কটের দলে। সব চেয়ে বড় কর্মী বাইশ মাসে বছর ঘটায়। আর আমাদের মত ছা-পোষা যারা তারা বছর ঘটায় বিয়াল্লিশ মাসে। অনেক সময় মাসের হিসাব থাকে না।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাই ?

আমার সেই দরখাস্ত ?

কোন দরখাস্ত ?

সেদিন যে দিয়ে গেলাম।

ওঃ, সেইটে চলে গেছে।

কোথায়?

যেখানে যাবার সেখানে।

প্রশ্নকর্তা থমকে যায়। ওরা তো বোঝে না, বাড়িতে তোর বউদির মুখ ঝামটা খেয়ে মেজাজটা তিরিক্ষে হয়ে আছে, তাই শোধ নেবার মত লোক পেলে ফিরতি ঝামটা দেই।

আবার প্রশ্ন করল, কোন খানে?

হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলাম, ঐ খানে।

আমার ইঙ্গিত উত্তর থেকে দক্ষিণে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘুরতে লাগল। প্রশ্নকর্তাও ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে বিরক্ত হয়ে একদিন প্রশ্নকর্তা আসা বন্ধ করল। আমরাও নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। তোর বউদি কি বলে জানিস, এই স্বদেশী সরকার যদি কখনও উঠে যায় তা যাবে শুধু তোমাদের মত কেরাণীদের জন্য আর অতি বশম্বদ পুলিশের জন্য। যাদের ভক্তি শ্রদ্ধা কিছু ছিল তারাও খিঁচরে গেছে।

তা বই কি।

আরে মন্ত্রী-ফন্ত্রী ওরাতো কিছু করতে চায়। ষোল আনা ফাঁকি ওরা দেয় না। ষোল আনা যখন আঠার আনায় ষোলকলা প্রাপ্ত হয় তখন বুঝবি ও শুধু আমাদের দয়াতে। যাই বলিস, এরপর যে সরকার আসবে তাদের প্রথম পুরষ্কার দেওয়া উচিত কেরাণী আর পুলিশকে। এরা যদি গরীব দুঃখাদের মন খিঁচরে না দিত তাহলে এ সরকার কখনই গদী ছাড়ত না। বলতে পারিস, আমরাই সত্যকার দেশসেবী।

মন্ত্রিরা লিখে দিল, অত্যধিক জরুরী।

অত্যধিক জরুরী পত্রের উত্তর দেওয়া হল। তারিখটা দেখে নিস, অতি জরুরী জরুরীত্ব লাভ করেছে কম সে কম ছ মাস পরে। তাও ভাগ্যি পারিষদদল কিছুটা তদ্বির করেছিল, নইলে তাও হত না।

তবে মনে রাখিস, যদি অভিযোগ করিস তাতে তোর লাভ হোক আর না হোক অভিযুক্ত প্রাণীটির লাভ হবেই হবে। যে ছিল সহকারী সে তখনই হবে প্রধান। এ বোকামি কখনও করিস না, বরং তোয়াজ করে যা পাস নিস। বাইরে গিয়ে গাল দিস। আমাদের ওসব কাকস্য পরিবেদনা।

আমাদের সত্য মিত্তির ছিল এখানে টাইপিষ্ট। মাঝে মাঝেই খবর আসত কারও কারও কাছ থেকে সত্য মিত্তির দক্ষিণা নিয়ে থাকে। ভাবলাম চাকরি বুঝি থাকে না। হঠাৎ সে পরিদর্শক হয়ে বদলি হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, কিহে মিত্তির, হঠাৎ কপাল ফাটল কেন? বলল, মামা। মামার তাগদ্ থাকলে ওসব নালিশ ফালিশ কিছুই নয়। মিত্তির বদলি হল ছোট্ট জেলা শহরে, যাবার আগে দিদি খুঁজে গলায় মালা পড়িয়ে দিল।

শ্রীমতী ছোট্ট শহরে গিয়ে নাক সিঁটকে বলল, এমন নোংরা জায়গায় থাকব না, বদলি নাও।

নাও বললেই তো হয়না। মিত্তির আবার মামার সুপারিশ ধরল। বদলির হুকুম গেল। মিত্তিরের জায়গায় বাঁড়ুজ্যেকে বদলির আদেশ দেওয়া হল। ভাবলাম, মামলা বুঝি এখানেই শেষ। তা আর হল না।

মাস দুয়েক আগে মিত্তির কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, কুলোদা বদলির আদেশ নাকচ হয়ে গেছে।

সে কিহে?

বাড়ুজ্যের মামা আমার মামার চেয়েও জোড়ালো। আমার মামা বদলির ব্যবস্থা করেছিল, বাড়ুজ্যের মামা সেটা নাকচ করেছে। এখন শ্রীমতীকে নিয়ে হাল্লাক হয়ে গেলাম। শ্রীমতী গৃহত্যাগ করে আর কি। শ্রীমতীকে ঘরে রাখতে হলে আবার খট্-খটে ফিরতে হবে।

মিত্তির ফিরে গেছে। আর দেখা হয়নি।

ঐ দেখ নিকুঞ্জ কেমন গোপাল ভাঁড়ের গল্প শুরু করেছে। ওহে ও নিকুঞ্জ ফাইল বন্ধ করে সারাটা বেলা যে কেটে গেল, কাজ করবে কখন?

নিকুঞ্জ বলল, কুলোদা বড় বেরসিক। আগে শুনতাম, পৌরবাবার আপিসে চাদর চাকরি করে, মানুষ চায়ের দোকানে আড্ডা জমায়। মহাকরণে চাদর ও মানুষ দুই রয়েছে, এই তো কাজ। বাগরা দিওনা কুলোদা। ওরে ও গোবিন্দ, তারপর তোর গিন্নী কি বলল, রেগে গেল বুঝি?

রাগবে বই কি, বলে গোবিন্দ বিড়িতে আগুন দিল।

আবার বলল, গিন্নী বলল, দেখ দেখি ছোড়দির কপাল। তার স্বামী মহকুমা আদালতের পেশকার। তার উপায় কত? নতুন নতুন গয়না পরে ছোড়দি

আসে আর তোমার গোনা পয়সায় মুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তার চেয়ে বদলি নাও, ছোট্ট জামাইবাবুর মত কোন আদালতে পেশকারি নাও।

নিকুঞ্জ মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, খাসা বলেছে বটে। গিন্নীকে হাইকোর্টে পাঠাও হে, ভাল সওয়াল করতে পারবে। বিলতে ফেরত ব্যারিস্টারও ঘোল খেয়ে যাবে। যাকে বলে রিয়ালিষ্ট, তোমার গিন্নী তাই।

কুলেন্দু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, শুনলি তো।

শুনলাম।

ওদের ফাইলে কাগজ পৌঁছালে সে কাগজ একশ বছর পরে মহাফেজখানায় পাবি তার আগে ট্রেস পাবি না, বুঝলি। ইতিহাস পড়েছিস? রোম সাম্রাজ্য যখন ধংস হয় তখন রোমবাসিরা নীতির ধার ধারত না। বিলাস, ব্যাভিচার আর দুর্নীতি রোমকদের পঙ্গু করে দিয়েছিল তাই বিশ্বজোড়া তাদের সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়েছিল। আমরাও তার কাছাকাছি এসে গেছি, বুঝলি। তবে আমাদের দেশে ঢোল বাজাবার লোকের তো অভাব নেই, ভাঙ্গা ঢোল বাজিয়ে চলেছে, তবে সে মুরোদ ফুরিয়ে আসছে।

কুলেন্দু কথা শেষ করে মাথা নীচু করে বসে থাকত কিন্তু মাথা উঁচু করে বলত হরিপদ। জেলখানায় হরিপদের সাথে দেখা।

হরিপদ বলল, ভাঙ্গবে।

কি ভাঙ্গবে?

এই শাসক।

কেন?

যারা বুভুক্ষুকে পেটায় তারা ভগবানের অভিশাপেই ভাঙ্গবে।

বুঝলাম হরিপদের কথা।

বললাম, তুমি তো লাঠিপেটা খেয়ে আটক হয়ে আছ, দুবেলা ভাত জুটছে, আর যারা লাঠিপেটা খেয়ে আটক হয়নি তাদের এক বেলাও ভাত জুটছে না। তাদের কি হবে বলত?

তারা মরুক।

লাভ।

মরলে মানুষের চোখ ফুটবে।

মরা মানুষ তাকায় না।

তাকাবে তারা যারা মরতে দেখবে।

তারা ভয়ে কোঁকাবে।

তা হলে ?

যারা আধপেটা খায় তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তবেই ভাঙ্গবে। যাদের পিঠে লাঠি পড়েছে আটক হয়নি, মরেনি, তারাই ভাঙ্গবার অস্ত্র তৈরী করবে মানুষের মনে।

তবে তাই হোক।

হরিপদ মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। হরিণবাড়ির দেওয়াল ভেদ করে তার চোখের জ্যোতি বাইরে বুঝি ঠিকরে বের হচ্ছিল।

আমরাই ভেঙ্গে দেব। বলে হরিপদ আকাশের দিকে চেয়ে দেখল।

আমি ফিরে এলাম।

ঃ দুই ঃ

টালির নালা পেরিয়ে দুর্গাপুরের জঙ্গলের কিনারায় ফেরিঙ্গিরা গোপন আস্তানার পত্তন করেছিল। কেল্লা থেকে বেরিয়ে আরবী ঘোড়ায় জিন কসে সায়েবরা আসত বাগান বাড়িতে। তাদের অভিসার লোকে দেখতে পেত না।

বিলেত থেকে জাহাজ এলে আসত শুধু লড়াইয়ের রসদ আর ফৌজ। জাহাজ খালি হলে সওদা ভর্ত্তি করে চালান দিত বিলেতে। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়বার মত মাঝে মাঝে গাউন-পড়া বিবিরাও নামত দু একজন। তাদের কুলশীল কেউ জিজ্ঞাসাও করতনা। মরার ওপর শকুন পড়ার মত সায়েবরা ঝাঁপিয়ে পড়ত। অর্থের কৌলিণ্য মেপে বিবিরা আংটি বদল করত। সে আংটির চাকচিক্য সব সময় সমান থাকতনা। আদালতে বিচ্ছেদের হুকুমনামা যে জারি করাতে পারত তার আংটি নতুন করে উঠত বিবির হাতে।

যাদের ভাগ্য ছিল ভুষো মাখান তারা গায়ের রং-এর কদর ভুলে খুঁজে পেতে বঙ্গ ললনার শাড়ীর আঁচল আঁকড়ে ধরত, সুবিধা বুঝে গাউন চাপিয়ে দিত তাদের দেহে। ভুষো কালিতে আলতার প্রলেপ দিত কেউ কেউ।

টালির নালার ওপারে গোপন আস্তানায় তাই আশ্রয় পেত নতুন নতুন কালো কালো মিসেস্। সন্ধ্যার আঁধার নামবার আগেই আরবী ঘোড়া এসে থামত আস্তানার সামনে! বলনাচ হত কিনা এমন খবর এখন পাওয়া যায় না। তবে পণ্যশালার পণ্য কিছু মর্যাদা লাভ করত এসব আস্তানায়।

দখিণ পাড়ায় তখন সাহস করে দেশী মানুষ দিনের বেলায় একা চলত না। ঠ্যাঙ্গারের দল নাকি বনবাদারে ঘাপটি মেরে থাকত। বাঁশের কোঁড় ছুড়ে ঠ্যাঙ্ ভেঙ্গে লুটে নিত সর্ব্বস্ব। অনেক দূরের যাত্রী আসত নদী পথে কালীঘাটে পূজো দিতে। আজকের মত সেদিনও ভীড় জমত। আজ মানুষে আর পয়সায় টানাটানি চলে, সেদিন পয়সার চেয়ে মানুষের মাথা নিয়ে টানাটানি চলত বেশী। বাদারের জমিদাররা পাকড়াও করে আনত

অসহায় মানুষকে, হাড়িকাঠে ফেলে দেবীর পূজা দিয়ে মানত পূর্ণ করত। মানত আজও পূর্ণ করে জমিহীন জমিদারের দল, মাথা কাটতে পারেনা বলে পকেট কাটার চেষ্টা করে। পূজারীরা সে কালে ছিল দর্শক আর চালকলা-বাঁধা বামুন মাত্র, আজ আর তা নয়, তারা জানে দেবীর সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য। তাদের সোল এজেন্সীতে তাই চালকলার চেয়ে নিকেল রূপোর টুকরো এজেন্সীর সেলামি বলে পাবার চেষ্টা তাদের সবারই।

সেদিনকার দখিণ পাড়ায় ঠ্যাঙ্গারে বাদ দিলে ছিল শুধু ফেরিঙ্গি। ঘন-বনের মাঝে ইঁটের শক্ত দালানে ব্যভিচারের স্রোত বইত। সেই ব্যভিচারের মোহ মৃত্যুর পরও নাকি ঐ ফেরিঙ্গি পাড়ায় গড়িয়ে বেড়ায়। ডুয়েল বাড়ীতে আজও নাকি পথিকরা ফেরিঙ্গি ভূত দেখে। না দেখাটাই আশ্চর্য। পিক্‌টোরিয়াল লেসেন্‌স্‌ আজও কালা আদমীরা নিচ্ছে।

নগাদা বলত, ওরা জ্যান্ত থেকে যতনা মন্দ করেছে, মরে গিয়ে তার চেয়ে বেশী মন্দ করছে। হেষ্টিংসের ভূত নাকি এখনও মানুষে দেখতে পায়। আট হাজার মাইল পেরিয়ে ভূত মহারাজ যখন কোলকাতার দখিণ পাড়ায় মাঝে মাঝেই আসে তখন বুঝতে হবে কোলকাতার মানুষকে সে কত ভালবাসে।

জাহাজে আর মেম আমদানি হয় না। কিন্তু কালো মেমদের অত্যাচারে আর বাঁচিনা। বুঝলি ?

নগাদা জিজ্ঞাসা করে, বুঝলি, কিন্তু বুঝিয়ে বলতে তার জিব যেন আটকে যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম, কালো মেমদের অপরাধ ?

আরে বুঝিসনা, মেম কালোই হোক আর সাদা হোক তারাতো মেয়ে-ছেলে। ওদের নিয়েই তো যত হাঙ্গামা। কুরুক্ষেত্র বলিস আর রামায়ণের যুদ্ধই বলিস আসলে ঐ মেম সাহেব। মানুষ যখন আত্মরক্ষার সুযোগ পায় না, তখন মেয়েদের আঁচল ধরে আত্মহত্যা করে, বুঝলি।

অর্থাৎ ?

শহর কোলকাতায় কালো মেমদের কি খেলা চলেছে, বুঝিস না। আমাদের মত খবরের কাগজে চাকরি করলে সব জানতে পারতি।

চাকরিটা যখন পাইনি, তখন খেলা দেখবার সুযোগও পাইনি।

মাঝে মাঝে সরব ঘোষণা শুনি, পুলিশ নাকি চোখ কান বুঁজে রয়েছে। ওরাতো জানেনা জায়গা বুঝে পুলিশ চোখ বুঁজে থাকে। হুজুরদের চেয়ারের পায়া ধরে টানাটানি করলেই পুলিশ চোখ মেলে তাকায়, সেই সাথে চলে লাঠি আর গুলী। পুলিশ চোখ খুললেই অপরে চোখ মেলে তাকাতে ভয় পায়। খোলা চোখ আপনা থেকে বুঁজে যায়। আর যখন চেয়ার মজবুত থাকে তখন পুলিশ ঘুমোয়। আসল কথাটা নগাদা বুঝিয়ে বলেনি। দশ বছরে কয়েক হাজার লোক কোতল করে হুজুররা দিব্যি নাকে তেল দেয়, আর দু'বছরে দশজন কোতল হলে প্রজাবিদ্রোহ ঘটে। অভিধানটা হুজুররা লেখেন আর আমাদের মত মুখ্যু মানুষকে পড়ে শোনান।

নইলে বড় বড় রাস্তায় সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে দেহ পরিচর্যার আশ্রম খুলবার সাহস লোকে পেত কি কখনও। এ আশ্রমের শিষ্যদের তালিকা পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই রয়েছে, নামগুলো একটু ভাল করে দেখলে, বুঝতে পারা যায় পুলিশ কেন চোখ বুঁজে থাকে। নগাদা ভালই বলেছে, আসলে ঐ মেম সাহেব।

অতীত যুগের খেঁদি-পেন্তিদের লাইসেন্স নিতে হত। আজকের যুগে লাইসেন্স বড় মহার্ঘ। তখন উপার্জনটা ছিল একজনের, এখন ভাগ বাঁটোয়ারা হয় মালিক-মালিকার মাঝখানে। তাই লাইসেন্সের বড় বালাই নেই। সোজা পথ ঐ দেহ পরিচর্যার আশ্রম।

সবিতা।

পুরুষ না মেয়ে বুঝতে পারিনি। নামের শেষে আকার যুক্ত হলেই স্ত্রী বুঝায়। বাদ শুধু দাদা, বাবা, কাকা। ব্যতিক্রম শুধু সবিতা।

সবিতার সাথেই ভেলুদা এসেছিল।

একটা লিখে দাওতো ভাই।

দরখাস্ত! এই শীতের সকালে জমাট গরম কম্বলে দু'কাপ চা খাওয়া সম্ভব, দরখাস্ত নয়।

না না ঠাট্টা নয়। সবিতার বড় বিপদ।

চাদরমুরি দেওয়া প্রাণীটির দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, সবিতা স্বয়ং নারী। সূর্যও নয়, সবিতৃ শব্দের প্রথমার একবচনও নয়। নেহাত একটি নামকা ওয়াস্তে মহিলা। নারীর বিপদ, অর্থাৎ ভেলুদা তৎপর হয়ে উঠবে এতে আর আশ্চর্য কি। ভেলুদাকে পুরুষ মহলে বিশেষ দেখা যায় না, মেয়েরা তাকে বড়ই পছন্দ করে।

ব্যাপারটা কি ভেলুদা ?

একটা ইউনিয়ন করতে হবে।

কিসের ?

তাইতো বলতে এসেছি। সবিতাই বলবে। বল, সবি তুমিই বল।

কথা বলল সবিতা।

আজ্ঞে ব্যবসা পত্তর মন্দ চলছিনা, বলতে গেলে ভালই চলছিল। আগের দিনের কথা শুনতাম যে ঘরে বউ থাকলে সহজে কেউ আর আমাদের পথ মারায় না। এখনকার ছেলেদের তেমন সহজে বউ জোটে না।

সবিতা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল।

বললাম, ভেলুদা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

খুব পেরেছ যাদু। পতিতারক্ষা সমিতির মেমোরাণ্ডামটা তৈরী করে দাও। তোমার যা ব্যবসা তা তুমি কর। বিনিময়ে পয়সা পাবে। শুনতে আপত্তি কেন ? হাকিমদের নোংরা মামলা করতে হয় বলেই কি হাকিমরা নোংরা হয়। তোমরাও তাই।

জিজ্ঞাসা করলাম প্রেসিডেণ্ট কে ?

আমি, বলে ভেলুদা সবিতার মুখের দিকে তাকাল। সবিতাও মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

যাবার বেলায় সবিতাই বলে গেল, সমিতির দরকার ছিলনা। কিন্তু গরজ বড় বালাই। আজকাল শহরের এ-কোনায় সে-কোনায় যেভাবে দেহ পরিচর্যার আশ্রম পাইকারী রেটে খোলা হচ্ছে তাতে আমাদের ব্যবসার বড় ক্ষতি হচ্ছে। আর দু'এক বছর এভাবে চললে আমাদের সব ভিখে বের হতে হবে। তা নইলে গাঁটের কড়ি খরচ করে সমিতি করবার কি দরকার বলুন। তার ওপর আর দুঃখের কথা বলবেন না। আরেক ভূত দেখা দিয়েছে। তারা নাকি নাচে আর কোঁদে। আমাদের রুটি-রুজি মারা যাবার জোগাড়।

সবিতার ইঙ্গিত অত্যধিক স্পষ্ট।

ভেলুদা বলল, শুনলে তো।

শুনে যে স্বর্গের দুয়ার খুলে যায়নি তাই ভাবছিলাম।

নগাদা বলে, আরে ওসব কিছু নয়, আসলে পয়সা। পয়সা না থাকলেই মানুষ হাঁতড়ে বেড়ায়। হাঁতড়ালে সাপের গর্তেও হাত পড়ে। ওরা বিষ খেয়েছে, তাই বিষের নিঃশ্বাস ফেলছে। দুনিয়াতে ভাল মানুষ পাওয়া বড় কঠিন, বুঝলি।

বুঝতে পারিনি। বুঝলাম সেদিন ট্রামে যেতে যেতে। দুজন ভদ্রলোক সামনে বসে গুলতানি করছিল। শোনবার ইচ্ছে না থাকলেও শুনতে হল।

এ রাস্তার নাম জানিস?

কেন বল দেখি?

এ রাস্তা যে মহাপুরুষের নামে সেই মহাপুরুষ স্যার রাসবিহারী ঘোষ ছিলেন মর্টগেজ আইনের এক্সপার্ট।

তাইতো শুনেছি।

সেটাই তো পরিহাস। রাসবিহারী এভিন্যুর দুপাশের অনেক বাড়িই এর মধ্যে মর্টগেজ পড়েছে মেরুয়াদের কাছে।

বলেই বক্তা হো-হো করে হাসল।

না হয়ে যায়। অবসর প্রাপ্ত মহামহা রথীরা বাড়ি করে ছিলেন। বাড়ি করবার সময় ভাবেন নি ভবিষ্যত বংশধররা চুণকাম করবার পয়সা পাবে কি না। বড় চাকরের ছেলেরা বড় চাকর হবে এমন মাথার দিব্যিও নেই, এমন গ্যারাণ্টিও কেউ দেয়নি। বিশ্বকর্মার পুত্র চামচিকে হয়ে জন্মায়, বাপের দোতালার পলেস্তারা খুললে কাদা দিয়ে পালিশ করবার পয়সা পায় না।

যা বলেছিস। একবার এক হাকিমের ছেলে পড়াতে গেলাম। প্রথম দিনেই সাহেব জিজ্ঞেস করলে, কেমন বুঝলে মাস্টার? বললাম, খুব ভাল নয়, মোটামুটি মিডিয়োকার।

সাহেবের বাবা ছিলেন ইস্কুলের মাস্টার। বৃদ্ধ বয়সে পৌত্র পৌত্রীর রক্ষণাবেক্ষন করে পরলোকের কাজ সমাপন করছিলেন। তিনি বসেছিলেন পাশেই, বললেন, আজকাল মাস্টারাই মিডিয়োকার।

অপ্রস্তুত হয়ে দাড়িয়ে রইলাম।

সাহেব বললেন, যাই হোক পড়াও তো।

মাস পেরোয়নি। হঠাৎ দেখা গেল, আমার মিডিয়োকার ছাত্র অন্তরীক্ষে গমন করেছে। তবে হাকিমের ছেলে, সেও খাসা হাকিম। বাজারের রোমাঞ্চ উপন্যাস আর বোম্বাইয়া ছবি দেখতে দেখতে তার মনে য়্যাডভেনঞ্চারের প্রলেপ পড়েছে। যাবার বেলায় ছোট্ট এক টুকরো কাগজে 'I want to become a detective' লিখে ছোট বোনের হাতে দিয়ে, সঙ্গোপনে বলে গেছে, বাবা আপিস থেকে ফিরলে দিস্। কিন্তু পাথেয় পাবার আশায় কারুর দিকে সে চেয়ে থাকেনি, পিতার পিসতুতো ভাইয়ের স্যুটকেস থেকে দুখানা একশত টাকার নোট আর কিছু খুচরো নিয়ে সরে পড়েছে।

পিতামহ বলল, কি বুঝছ মাস্টার?

বললাম, নেহাত মিডিয়োকার কিনা!

বৃদ্ধের চোখ আপনা থেকেই বুঁজে এল। তার খরচাতেই দেনা শোধ করেছি তা বুঝে চুপ করে গেল।

ওহো ট্রাঙ্গুলার পার্ক এসে গেছে, নামছি।

একজন নেমে যেতেই আর একজন চুপ করে বসে রইল।

পেছন থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, মহাশয়ের কি করা হয়?

প্রশ্নটা কাকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হয়েছে তা বুঝতে না পেরে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে বলছেন?

আজ্ঞে হাঁ, ট্রামেতো লোক নেই, রয়েছি আমরা দু জন। আর কাকেই বা জিজ্ঞাসা করব।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আজ্ঞে রেলের হেড অপিসে কাজ করি।

বাড়ি কি এখানে?

আজ্ঞে না, পাকিস্তানে ছিল।

বালিগঞ্জেই থাকেন বুঝি?

বালিগঞ্জ শুনেই ভদ্রলোক তিরবিরিয়ে উঠলেন।

বালিগঞ্জে কি কেরাণী থাকে মশায়, বালিগঞ্জে থাকে মনসবদার আর সুবেদার। আমাদের ও সামর্থ্য নেই। থাকি কসবা, খগেন সেন রোডে।

ভদ্রলোক বিমর্ষভাবে বসে রইলেন

নেমে পড়লাম।

আরে রুনু যে!

রুনু আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে উঠল, চিনতে পারলাম না তো! আমার উচ্ছ্বাস থেমে গেল, তবুও বললাম, আমি দামোদর, তোমার সাথে নীচের ক্লাশে পড়তাম।

ও দামু, বলে রুনু ভাল করে আমার আপাদ মস্তক দেখে নিল। বোধ হয় চিনতে পারল।

ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির লোভ সামলাতে পারলাম না। আন্তরিকতার সাথেই বললাম, কতদিন পরে দেখা। না চেনা আশ্চর্য নয়।

কোথায় চললে? একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলাম।

একটা পার্টি আছে। আচ্ছা আবার দেখা হবে। চললুম।

ষ্ট্যাণ্ড থেকে ট্যাক্সি ডেকে রুনু দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

কেরাণীবাবুর ক্ষিপ্ততার কথা মনে হল।

রুনু আমার বেশ-ভূষার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে, আমার সামাজিক অর্থাৎ আর্থিক মর্যাদার মেজারমেণ্ট বুঝে নিয়েছিল। পার্থক্যটা সহজভাবেই চোখে পড়েছে, তাই রুনু বোধ হয় পালিয়ে বাঁচল। সমাজ আজ টাকার চাকায়, রুনুর ত্বরিত গমন সেই কথাই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল।

এসব পুরানো কথা।

তার চেয়েও পুরানো কথা রয়েছে।

তখন ও পাড়ায় জঙ্গলে ঠ্যাঙ্গারে থাকত। ঠ্যাঙ্গারে থাকুক আর নাই থাকুক, সোঁদর বনের দলভ্রষ্ট বাঘিনী মাঝে মাঝে আসত। ধোপারা ছিল স্থায়ী বাসিন্দা। ইঁটভাটার ইঁট শহর তৈরী করত, ইঁটের চাপে শহরে মানুষের মন চাপা পড়ত। ইঁটের ডোবায় জল জমলে ধোপারা কাপড় কাচত। তখন শহর গড়ে ওঠেনি ও পাড়ায়। বজবজের রেল লাইন পাতবার সময়

কর্তাদের প্রথম মনে হল, ইঁটভাটার ডোবাগুলো জুড়ে দিলে ভিয়েনার মদির স্বপন দেখা সহজ।

পোদ বাগ্‌দী আর পালদের বস্তি ভেঙ্গে নতুন মানুষের আস্তানা তৈরীর জমি দখল করল সরকারী বেসরকারী আধা সরকারী মানুষের দল।

এল সেখানে নতুন মানুষ।

পুরানো মানুষেরা রেলের লাইন ডিঙ্গিয়ে ওপারে ঘর বাঁধল। শহর বাড়বে, কতটা বাড়বে তার চৌহদ্দি সরকার ঠিক করে দেয়নি। তিনপাশে হাত পা মেলে দিচ্ছে শহর। পশ্চিমে আটকে গেছে গঙ্গার গায়ে তাই ধাক্কাটা পড়েছে পূবের ডাঙ্গায়। রেল লাইন পেরিয়ে যারা গেল তারাও নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারল না। শহরের গতর বাড়ে, আবার তল্পীতল্পা বেঁধে নতুন আস্তানার খোঁজে তারা বের হয়। ঘর ভেঙ্গে ঘর গড়ে। যার ভাঙ্গে সেও গড়ে, যে ভাঙ্গে সেও গড়ে।

নীরদবাবু সাচ্চা লোক।

শহরনীতির দুরদৃষ্টি ছিল বলেই.দেড়শ টাকা সম্বল করে আজ সাতখানা বাড়ির মালিকানা তার।

দেড়শ টাকায় সেকালে ছ কাঠা জমি সহজেই পেয়েছে।

পোস্টাপিসের কেরাণী, সরকারী তহবিল থেকে ধার নিয়ে ইঁটের পাঁজা বসাল, ইঁট দিয়ে দোতালা বাড়ির পত্তন করল।

বছর ঘুরল না। ঘোড়ার ট্রাম আর তখন চলে না, বিজলির ট্রাম ছুটছে, ছুটতে ছুটতে রেললাইনে ধাক্কা খেয়ে ট্রাম দাঁড়িয়ে গেছে। ট্রাম থেকে নেমে সোজা একদল মানুষ রেল পেরিয়ে আশ্রয় করে নিল নীরদবাবুর পাড়ায়। দাঁও বুঝে তিন হাজার টাকার বাড়ি ছ হাজারে বিক্রি করে নীরদবাবু জমি কিনল পনর কাঠা। এবার জমির দামটা বেড়েছে। তাতে কি, এও তো ব্যবসা। মাসকাবারি বেতন থেকে সরকার টাকা কাটে কর্জশোধের। গায়ে গায়েই শোধ।

তিন কাঠায় নতুন বাড়ির পত্তন করে নীরদবাবু।

ছ মাসে বাড়ি আবার হাত বদল হয়।

এবার পেল কম্পাউণ্ড ইনটারেষ্ট।

নীরদবাবু এগিয়ে চলে।

অল্পবিত্তের মানুষের দলও এগিয়ে আসে, আশ্রয় খোঁজে। কোলকাতার আসল জমিতে হাত দেবার সামর্থ্য এদের নেই, সামর্থ্যবানের দল এসেছে হাজার মাইল পেরিয়ে। তারাই খোদ কোলকাতার অর্ধেক ভূমির মালিক।

মনে মনে গজরায়। তাইতো সবই গেল রইল কি!

ব্যবসা কর। শিল্পে হাত দাও।

মানিকতলার মাঠে দরদী ঋষি কারখানা খোলেন। কারখানায় মানুষের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হয়। দেশের লোক হাত বাড়িয়ে দেয় কারখানার কদর বাড়াতে।

ঋষি দেহত্যাগ করলেন।

হিসাব করে পরিসংখ্যনবিদরা বললেন, শতকরা পঞ্চাশ জনের বেশি লোক আমদানি হয়েছে বিভুঁই থেকে।

কৈফিয়ত, বাঙ্গালীর ছেলে কায়িক শ্রম করে না।

তাই আনতে হয়েছে।

কুলোকে বলে, মিথ্যা কথা। বাঙ্গালীর ছেলে 'জো হুকুম নয়' তাই তারা কাজ পায় না। মালিক যারা তাদের সাথে কর্মীদের প্রাণের বাঁধন নেই, টাকার বাঁধনে চির্ খাচ্ছে।

ওদের হিসেব মত দেখা যাচ্ছে, এদেশের লোক কাজ করে না। এদেশের লোকের নজর উঁচু তারা হতে চায় মালিক অথবা কেরাণী।

মালিকের সংখ্যা?

সেটা নাই বা বললাম।

কেরাণীর সংখ্যা?

ইংরেজ ছিল, সংখ্যাও ছিল। ইংরেজ গেছে, নতুন মালিক মুলুকসে আদমি আনতা হ্যায়। বাংলার দুলাল 'No vacancy-র নোটিশ দেখে ঘুরে আসে। রাত জেগে কবিতা লেখে। কবিতা শুনবার লোক না থাকলে, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কবিতা পড়ে।

লোকে বলে পাগল।

যুবশক্তির অপচয় দেখে পরলোকযাত্রী পত্রিকা কুম্ভীরাশ্রুপাত করে। রোয়াকে বসে রোয়াকবাজরা বাহোবা দেয়, হাঁ চুটিয়ে লিখেছে বটে, বঙ্গদরদী বটে!

রাণা প্রতাপের দেশের লোক তলোয়ার ভেঙ্গে ব্লেড তৈরী করে পকেট কাটছে। তার পয়সায় কাগজ চলছে, সেই কাগজে সাম্প্রদায়িকতা!

এ সব কি লিখছ হে?

আজ্ঞে মাঝে মাঝে তাতিয়ে দিতে হয় হুজুর, নইলে কাগজ বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষের জাত রেষ্টুরেন্টের ভেজিটেবল চপ। বাসি হোক, পচা হোক উনুনে সেঁকে নিতে হয়। নইলে বিকোয় না।

জিতা রহো বেটা। একটি পেগের বন্দোবস্ত করে বেরিয়ে গেল আসল কাগজওলা।

দখিণ পাড়ায় উৎসব বড় কম।

সে পাড়ায় পার্টি বেশি। পার্টিতে নরসংখ্যা থেকে নারীসংখ্যা বেশি। জমে মন্দ নয়। নরের দল আধখানা রসগোল্লা খেয়ে সাতাশবার ঢেকুর তুলে পরিতৃপ্তি ঘোষণা করে। মেয়েরা চকোলেট খায়। হাঁ করে মুখের ভেতর টুপ করে চকোলেট ফেলে দেয়। রসগোল্লার চট্চটে রসে ঠোঁটের রং ফ্যাকাশে হবার ভয় আছে। তাই পার্টিতে বসে ওরা রসগোল্লা খায় না।

পুরুষরা প্যাণ্ট, কোট পড়ে টাই ঝাঁকায়। ঝাঁকুনি দিয়ে বুঝিয়ে দেয় ওরা পুরুষ মানুষ। নইলে দাড়ি গোঁফ যেমনভাবে ছাঁটা আর গলার শব্দ এমন চিঁহি-চিঁহি সুরে বাঁধা যে দূর থেকে তাদের পুরুষ মনে করে সাধ্য কার।

বেঁচে থাক হিন্দী ভাষা। পুলিশ নাকি ওদের ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ। ভাগ্যি ফতোয়া দেয়নি। পার্টির ঐ মানুষগুলো ঠিক পুরুষও নয় নারীও নয়। তবু ভাল, পুলিশ মাঝে মাঝে সমঝে দেয়। এরা তাও দেয় না।

নগাদা বলে, পুলিশ স্ত্রীলিঙ্গ কেন জানিস? —ওরা মেয়েদের মতই অবলম্বন ছাড়া চলতে পারে না। ওদের অবলম্বন উর্দী আর লাঠি। অর্থাৎ পুলিশ স্ত্রীলিঙ্গ এবং তার পুংলিঙ্গ লাঠোদী। কিন্তু ভাই, আমি তুমি জানি ওরা কোন লিঙ্গ। যখন লাঠি পেটায় তখন ওরা পুংলিঙ্গ আর অন্য সময়ে স্ত্রীলিঙ্গ। যাই বলিস, রাষ্ট্রভাষাবিদ্‌দের রসিকতা উপভোগ করবার মত।

নগাদাকে দক্ষিণ পাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। নগাদা বলল, ওখানে সব কবিতা।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ কল্পনা। ওখানে আসল মানুষ খুঁজতে খুঁজতে টেংরি খুলে যাবে।

তাই দখিণকে দখিণা পবনে ভাসিয়ে দে সুখে থাকবি। যাস আমাদের পাক্‌পাড়া কি পেনেটি, দেখবি আসল মানুষ কেমন পাওয়া যায়। পাক্‌পাড়া আর পেনেটির মানুষ সোজা সরল, আর সোজা সরল তাদের কাজকর্ম। আর দখিন ছোঃ। চুল পাকিয়ে ফেললাম সাংবাদিকতা করতে করতে, লোক চিনি না।

ওরা মনে করে রাজার ছেলে রাজা হবে। আর সে সুখ কি আছে। দু এক পুরুষ এ রকম চলে। তারপর ফেউ ফেউ। হাঁ, বলতে হয় উত্তুরে মানুষদের। খাশা জমি পাকা করে বসে রয়েছে। কোন পুরুষে বেনিয়ানি করেছে। ছয়-আট পুরুষ পর তারই বংশধর দেওয়ালের ইট বগলে নিয়ে বাড়ির স্পেসিমেন দেখিয়ে গ্রাহক সংগ্রহ করছে। এরা জানে, সোজা পথেই লক্ষ্মী আসে, সোজা পথেই বেরিয়ে যায়। তাই না উত্তুরে হাওয়াতে মেয়ে মানুষ ভেসে বেড়ায় পয়সার দাঁড়িপাল্লায়। আর দক্ষিণ, আর বলিস না। শেষ অবধি বাবুরা ছুটে বেড়ায় য়্যাডালটারির মামলার পেছনে। ঘরে পলেস্তারা দিতে না পারলে বড়বাজার ছোটে বন্ধকী-ব্যবস্থা করতে। চুপে চুপে যাই কর তা মোটেই ভাল নয়। তবে সবাই কি তাই? বাদ বাকী অনেক রয়েছে।

তবে জানিস, হাকিমের পোলা হাকিমের মেজাজ নিয়ে জন্মায়। হাকিম-বাপ যখন চোখ বোঁজে তখন মেজাজ থাকে হাকিম থাকে না। হাকিমের কড়িও থাকে না। ওরা ফুটপাতেও নামতে পারে না, ওপরের দিকেও তাকাতে পারে না। তাই পরবর্তী বংশধরদের পথে বসিয়ে গোপনে দাবার চাল দেয়। সাধারণ মানুষের সাথে ওরা কখনও মেশেনি, কখন মানুষকে মানুষ মনেও করে নি। তারপর এমন দিন আসছে, যেদিন শোধ নেবে ঐ পথের মানুষ। উঁচু নাকে পলেস্তারা দিয়ে নীচু করতে হবে। বুঝলি?

বুঝলাম।

বুঝবার সাথে সাথে ট্রামে পা দিয়ে দক্ষিণে রওনা দিলাম

জিজ্ঞাসা করলাম, যাবে রাণীকুঠি ?

মাথা নেড়ে রিকসাওয়ালা বলল, হাঁ বাবু।

উঠে বসলাম।

দেবমহলের পাশ দিয়েই যেতে হল।

শুনেছি, এখানে স্থান করতে পারলে ধর্ম অর্থ সবই লাভ হয়। প্রার্থীর সংখ্যা অগুনতি।

দালাল রয়েছে অনেক, আঙ্গুলে গোনা যায় না।

নিজের চেহারা ছবিতে নড়তে চড়তে দেখলে কে না স্বর্গসুখ অনুভব করে, তার সাথে অর্থপ্রাপ্তি, এ তো মহাভাগ্য।

কিন্তু সহজে ও রুদ্ধদ্বার খোলে না। মাশুল দিয়ে রোগ নিয়ে অনেক মেয়েই বাড়ি ফেরে। গরীবের ঘরের মেয়ে লেখাপড়া বাপমায়ে যখন শেখায় নি এবং রকফেলোর দল যখন রাস্তা হাঁটতে দেয় না, আবার মনের মত স্বামীও জোটে না, তখন সখ ও সৌখীনতা ওখানেই সম্পূর্ণ হবে এ ধাঁধা অনেকের চোখেই থাকে। গায়ের রক্ত গরম থাকলে ধাঁধা ছুটতে সময় দরকার হয়। শেষ পর্বে রূপোর দামে রূপ বিকিয়ে ঘরে এসে বসতে হয়।

ভেলুদা উকিল মানুষ। পতিতারক্ষা সমিতির সভাপতি। জ্ঞানগম্যি তারই বেশি। ভেলুদা বলে, সবিতা যে সমিতি করেছে ঠিক ওদেরই ভয়ে। আগে একসূট্রা মেয়েরা আসত সবিতাদের পাড়া থেকে। তখন ওদের উপরি আয় হত। এখন গেরস্ত ঘরের মেয়েরা এসে সে পথেও কাঁটা দিয়েছে। তোদের স্বদেশী সরকার কাজের রাস্তা খুলতে পারুক আর না পারুক অকাজের রাস্তা বন্ধ করতে পারে নি।

ভেলুদার কথা হেসে উড়িয়ে দেবার নয়।

মাঝে মাঝেই সে বলত, ঘরে যখন নায়ক হওয়া যায় না তখন বাইরে নায়ক হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, আর নায়িকা হওয়া সর্বত্রই সহজ। তবে ছবির নায়িকার রাস্তা বড় মোলায়েম নয়। তাই নায়ক সাজার অপরাধ লোকে অগ্রাহ্য করে, নায়িকা না হবার কলঙ্ক লোকে ভুলতে পারে না। ওদেরও জাত আছে।

জাত!

জাত মানে শ্রেণী। ওরা দল বেঁধে বসে আছে। ঐ দলে নাক ঢোকায় কার সাধ্য। চেষ্টা চরিত্র করে অনেকেই হাল্লাক হয়ে গেছে, বুঝলে ভাই। পর্দার ছবিতে মুখ দেখান অত সহজ নয়।

দখিন পাড়ায় মানুষ ছবি তোলে।

নিজস্ব হাজার তিরিশ, ঋণের হাজার তিরিশ, তারপর পয়সা থাকে না। মোটমাটে কারও তিন ভাগ কারও দু ভাগ তারপর যে যার প্রাপ্য নিয়ে সরে পড়ে। যারা প্রাপ্য হারায় তারা আদালতে ছোটে। শ'তে পঞ্চাশটা ছবি লোকের চোখের সামনে এসে হাজির হয়। বাকীগুলো ডাব্বা বোঝাই থাকে।

যার পয়সা থাকে তার ব্যবসা থাকে না। যার ব্যবসা থাকে তার পয়সা থাকে না। যারা সবার আগে ছবির ব্যবসা পত্তন করল, তারাই হাতে মালসা নিয়ে দেবমহলের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়।

ওখানে মিঠে কথায় চিড়ে ভেজে না। 'রুপি দো' আফগান ব্যাঙ্কের তাগাদা।

সামনের চায়ের দোকান রাত্রিদিন গরম।

দালালরা ওঁত পেতে বসে থাকে। বেপথুমতী কাউকে পাকড়াও করে রাজা বাদশা হবার স্বপ্ন দেখায়। 'আজকাল' করতে করতে ঠিক জায়গা মত পৌঁছে দিয়ে অবলার নায়িকা হবার স্বপ্ন ছুটিয়ে দেয়। নিজেও কিছু প্রসাদ ও দক্ষিণা লাভ করে দালালরা পরবর্তী শিকারের প্রত্যাশায় বসে থাকে।

আলিনগরের শান্তির দূত পুলিশ, রাষ্ট্রভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ। অন্তত এসব ক্ষেত্রে চোখ তুলে তাকায় না। এসব ক্ষেত্রে ওরা রাষ্ট্রভাষার সমজদার।

কতজন অজ্ঞাতে পা হড়কে গেল তার হিসাব দিলে হুজুররা গোসা হন। এত লোকের খাবার দেবার সামর্থ্য হুজুরদের নেই। তারা জেনেই রেখেছে, নিজেদের খাবার ব্যবস্থা হলে অপরে হিংসা করে। হিংসুক লোকের জ্বালায় ওরা কি না খেয়ে থাকবে। কে পা হড়কালো তা দেখবার সময় কোথায়?

হুজুররা গাড়ি চাপা পড়েন না। দু একজন চাপা পড়লে ডাক্তারের রিপোর্ট চাপা দেওয়া হয়।

নগাদা বলে, কেন জানিস? ফরাসী দেশের আঙুরের গন্ধ ওদের গায়ে। তাই নেংটা ফকিরের মান রাখতে ডাক্তারী রিপোর্ট গোপন করতে হয়। একটু

বেশি খেয়ে বেসামাল হলে ওরকম দুর্ঘটনা ঘটে বইকি। সে কথা কি লোককে বলতে হবে। হিংসুক লোকের সব সময় চোখ টাটায়। তোরা পাসনা তাই খাস না। পেলে কি খেতিস না।

ভাবনার গতি থামিয়ে রিক্সাওলা জিজ্ঞাসা করল, কোন গড়ে যাবেন ?

গড় ?

আজ্ঞে আজাদগড় না বিজয়গড় ?

থামিয়ে দিলাম। বললাম, বুঝেছি। গড় নয় পার্কে এ চল।

পার্কের গায়ে লেখা No Parking, রিক্সাওলা জিজ্ঞাসা করল, যাব না থাকব।

যা ইচ্ছে। যাওয়া আর থাকায় ফারাক নেই বন্ধু।

কথা না বুঝেই সে রিক্সা নিয়ে সরে পড়ল।

সায়েব কো সেলাম দো ?

নেপালী দারোয়ান ব্যারিষ্টার সায়েবের বাংলো পাহারা দেয়। পরে জেনেছি কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড।

সেই মামলাটা।

ওঃ, সেই সরকরাজ আমেদআলি ?

আজ্ঞে না। দামোদর এণ্ড পুতভুণ্ডী কোং।

সায়েব রঙীন জলের পাত্র তুলে মুখে দিলেন।

সওয়ালের ডেট কবে ?

আজ্ঞে কালকে ?

সায়েব শিষ দিতে দিতে আরেক চুমুক দিলেন গেলাসে।

বয়সটা আমার চেয়ে কমই মনে হল। য়্যাটর্নি সাহেবর নির্দেশে এসেছি, অতএব বয়স ও পাণ্ডিত্য হিসাব করবার অধিকার নেই।

আপনি কোন পার্টি ?

আজ্ঞে আমিই দামোদর।

সায়েবের খেয়াল হল। বলল, বসুন।

ব্রীফ বের করলেন।

কেসটা বলুন।

চোখ তখন রাঙা।

কেস বলতে বলতে সায়েবের চোখ বুঁজে এসেছে। ঝিমুনি কাটলে আরেক চুমুক দেন।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার য়্যাটর্নিতো মিষ্টার ঘউস্‌ট্‌ দেখছি।

আজ্ঞে হাঁ।

আর কেস করতে হবে না, বাড়ি যান।

কেন? আপনি কেস করবেন না?

নিশ্চয় করব। দু জেমের কৌঁসুলী কেস করব না। নিশ্চয় করব। কিন্তু সাতকাঠা জমি আপনার উদ্ধার হবে না।

আমার পয়েন্ট তো কাঁচা নয়!

তাও জানি। জাজমেণ্টে আপনি জিতবেন।

খুশী মনে বললাম, তা হলে যথেষ্ট।

কিন্তু আমি তা বলছি না। আমি বলছি সাতকাঠা জমি আপনার উদ্ধার হবে না।

বুঝলাম না।

সায়েব আরেক চুমুক দিয়া সিগারেট ধরালেন।

ঘউস্‌ট্‌ সায়েবের দপ্তরে জমির মামলা থাকলে, সে জমির মালিক বদল হয়। ঘউস্‌ট্‌ সায়েবের নাতির নামে তা খরিদ হয়।

চমকে উঠলাম।

ইংরেজের আইন, বুঝলেন। ওরা পাইকার আর ফড়িয়া দিয়ে কাজ করায়। যেমন হিন্দুর দেবদেবী। পুরুত না হলে আপনার পূজোই হবে না। তেমনি জজ সাহেবের কাছে পোঁছাতে হলে পুরুত দরকার। যাকে বলে এজেণ্ট। বিচার পাবেন, তবে পুরুতের চাল কলার বরাদ্দ মেটাতে জমি হাত বদল হয়ে যাবে।

সায়েব কেস করলেন।

আট বছর পর উত্তর পাড়ায় সায়েবকে দেশসেবা করতে দেখে খুশী হলাম। হাঁ সায়েব বটে। মানুষের জন্য দরদে তার বুকটা ফাট্‌ ফাট্‌ করছে, ফেটে যে পড়েনি এই ভাল।

তবে কপাল ফাটল।

এত বড় দেশসেবীকে ষোড়শোপচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজা দিল দেশের লোক।

কম কথা নয়, পঞ্চাশ জেমের কৌঁসুলি, অত বড় টাকার অঙ্ক ছেড়ে দেশ সেবা করছে, সে কি কম কথা।

বাড়ি এসে পুরানো চেকের পাতার কাউণ্টারফয়েল দেখে হিসাবটা মিলিয়ে দেখলাম। সত্যই অবাক কাণ্ড। দুই জেমের চেকের হিসাবটা এখনও চক চক করছে।

যাই একবার মা কালীকে পেন্নামটা জানিয়ে আসি।

রাস্তায় নটবরের সাথে মোলাকাত।

কি খবর নটবর?

নটবর চমকে উঠলো।

ভয় পেলে কেন?

একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, কাউকে বলিস না ভাই।

মানে?

আজ আমার বিয়ে।

বিয়ে! তা হলে বলব না কেন?

সেও এক ফ্যাসাদ। মীরার বাবা বিয়ে দিতে চায় না। তাই তাকে নিয়ে আজ দুদিন পালিয়ে এসেছি।

তাহলে রীতিমত পুলিশ কেস।

বিয়ে হয়ে গেলে কে আর পায়।

আইনে এ বিয়ে স্বীকার করবে না। কপালে সিঁদুর দিলেই বিয়ে হয় না। কালীঘাটের পাণ্ডার দেওয়া বিয়ে নিয়ে বহুত হাঙ্গামা হয়েছে।

তবে।

একদিন পুলিশ ধরবে। বিয়ে বাতিল হবে। কয়েক মাস অথবা বৎসর শ্রীঘর বাস।

কিন্তু মীরার বয়স আঠার পেরিয়েছে।

বাবার কাছে ফিরে গেলেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার বয়স কমবে। তখন তোর বয়স হবে তিরিশ, আর মীরার বয়স হবে পনর।

তবে উপায়!

উকিলের কাছে যা। ওরাই ভাল বুদ্ধি দেবে।

কদিন পরে আলিপুরের ফৌজদারী কোর্টে নটবরের সাথে দেখা। জিজ্ঞাসা করলাম, কি খবর নটবর?

সেই বিয়ে।

আমার কথা ফলল তো।

ফলতে দেই নি। সেদিন তোর কথা না শুনলে বিপদ ঘটত। গেলাম সরোজবাবুর কাছে। বললাম, সব। বলল, বড়ই কঠিন কেস। দাও দুশো। দিলাম দুশো। দুশো কেন পাঁচশও দিতাম। নিয়ে গেল রেজিষ্ট্রারের কাছে। বিকেল বেলায় সার্টিফিকেট নিয়ে ফিরে এলাম। তারিখ দেখলাম, আমার সাথে মীরার বিয়ে হয়েছে, যেদিন পালিয়ে এসেছি তার ঠিক দুই দিন আগে। গড় হয়ে সরোজবাবুকে প্রণাম করে ফেললাম। হাঁ, উকিল বটে। এরাই দিনকে রাত করতে পারে।

অবাক হয়ে তার কথা শুনছিলাম।

মীরা যে কখন সামনে এসেছে টেরও পাই নি।

এই মীরা, পরিচয় করিয়ে দিল নটবর।

সুস্মিতা মীরাকে দেখে মনে হল, নটবর দুশো টাকা অযথা ব্যয় করেনি। ট্রয় নগরের পতন ঘটলেও আশ্চর্য হতাম না।

সরোজবাবুকে আমিও মনে মনে পেন্নাম করলাম। সেদিন মা কালীকে পেন্নাম করে যা ফল পাইনি, আজ সরোজবাবুকে পেন্নাম করে সেই ফল পেলাম। নগাদাকে ঘটনাটা বলতেই নগাদা লাফিয়ে উঠল, বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে। যেখানে মিঞা রাজি বিবি রাজি সেখানে কি করতে পারে কাজি! কি হত বল দেখি। নটবরের জেল হত, মীরা পথে পথে ভাসত। তার চেয়ে ব্যাক ডেটের নোটিশ আর সার্টিফিকেট দিয়ে ওরা সুখে ঘর করবার লাইসেন্স পেল। যত সব বাহাত্তুরে বাপ-মা। বুঝে-সুঝে চল বাবা। অনর্থক বগ্‌রা দিস কেন। আমি হলে ডেকে এনে বিয়ে দিতাম। বুঝলি।

বুঝলাম।

কালী পেন্নাম করতে গিয়ে ঝরণা কলমটা হারিয়ে এসেছি। মা কালীর কি অপার মহিমা বুঝতে পারি না।

হাঁ মা, সবাই তো তোমার সন্তান। এক সন্তানকে পথে বসিয়ে আরেক সন্তানকে কেন মা রাজা করছ।

মা আমার কথা শুনে হাসলেন, কি লজ্জা পেলেন, কি কাঁদলেন তাই ভেবে পেলাম না। কিন্তু ঝরণা কলম আর ফিরে পাইনি।

ফিরে এসে ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম।

কি খবর দামোদরবাবু ?

অনেক দিন দেখা সাক্ষাত হয়নি তাই এলাম।

আমার কথা শেষ না হতেই পাশ থেকে ছিন্নবসনা একটি বালিকা বলল, ডাক্তারবাবু কানে বড় ব্যথা।

দে আট আনা। সাথে সাথে আদেশ দিল ডাক্তার।

ডাক্তারবাবুর কথা মত বালিকা আট আনা বের করে দিল।

ডাক্তারবাবু কান দেখলেন। ওষুধ দিলেন।

বালিকা চলে যাবার সাথে সাথে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি রকম চিকিৎসা ? রোগ না দেখেই পয়সা।

বোঝেন না মশায়। রুগীর পকেট দেখে ওষুধ দিলাম। না জেনে যদি দিতাম তা হলে দেবার পর বলতো চার আনা আছে। তাহলে আর চার আনা মার যেতো। ওরা জীবনেও চার আনা দিয়ে যাবে না। তাই আগে থেকে দামটা ঠিক করে নিলাম।

ডাক্তারবাবুর বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না।

নগাদা ঘটনাটা শুনে বলল, তোর ডাক্তারের সাথে আলাপ করিয়ে দিতে পারিস।

নিশ্চয় পারি। কিন্তু কেন ?

ওরকম মহাপুরুষ ব্যক্তির চরণ ধূলি না নিলে অপরাধ হবে। সত্যিকার বাঁচার অধিকার ওদেরই রয়েছে। নমস্য লোকদের সাহচর্যে পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপ শুদ্ধি লাভ করত।

হাসলাম।

হাসছিস। শোন, বাদশাহদের হেকিম থাকত। প্রথম ইংরেজ ডাক্তার

এল জাহাঙ্গীরের দরবারে। বাদশাহজাদীর অসুখ। শাহজাদী পর্দার ওপারে, এপারে দাঁড়িয়ে ডাক্তার। হেকিমরা তখন তেলোয়াত করছে। ডাক্তার এল ছুরি কাঁচি নিয়ে কিন্তু রুগীর দেহ স্পর্শ তো দূরের কথা, রুগীর মুখদর্শনই নিষেধ। অতএব, শাহজাদীর পর্দার আতর যে খুশবয় ছড়িয়ে ছিল, তারই গন্ধে শাহজাদীর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা চলল। সেই যুগের ঐতিহ্য বর্তমান যুগেও থেকে গেছে। ভারতের লোক ধর্ম ছেড়েছে, নীতি ছেড়েছে, পোষাক ছেড়েছে, ছাড়েনি শুধু ঐতিহ্য। তাই ফলো-আপ করছে মাটিয়া কলেজ পড়া ডাক্তার। ওদের ওপর রাগ কর না হে। ওরা রোগ না দেখেই ওষুধের দাম নেয়।

দখিন পাড়ার ডাক্তারের চেম্বার থাকে মধ্যপাড়ায়। বাড়ির গায়ে ঝুলতে থাকে সাইনবোর্ড আর দেশী বিদেশী ডিগ্রির ফর্দ্দ। দেশী ডিগ্রিটা ছোট করে লেখে, বিদেশীটা লেখে বড় করে।

কড়কড়ে নোট সামনে ধরে তবে কাগজে আঁচড় কাটাতে হয়।

কি অসুখ ডাক্তার সায়েব ?

ফিভার।

কালির আঁচড় দেওয়া কাগজ নিয়ে খুসী মনে রুগী ফিরে আসে।

কি রোগ ? ফিভার! লিভার যে বলেনি তাই ভাগ্যি।

ডাক্তারবাবু বাঁচব তো ?

কি মনে হচ্ছে ?

বোধহয় বাঁচব না।

তাহলে হেভি ইনসিওর করুন। ওরে মিঃ ড্যাস্‌কে ডাকতো।

কাগজ পত্র নিয়ে মিঃ ড্যাস্ হাজির।

লিখুন বিশ হাজার।

ডাক্তারও লিখলেন, সুস্থ মানুষ। বিশ হাজার মঞ্জুর হোক।

রুগী আচমকা বলল, ফিয়ের টাকাটা ফেরৎ দিন ডাক্তার সায়েব।

কেন ?

আমার অসুখ তো নেই।

মানে।

ঐ যে লিখলেন সুস্থ মানুষ। সুস্থ মানুষ কি ফি দিয়ে ডাক্তার দেখায়। দিয়ে দিন চৌষট্টি টাকা। দেখি কোন কবরেজ দেখাব।

শুনেই নগাদা বলল, ক্লাইমেক্স।

আমি বললাম, য়্যন্টি ক্লাইমেক্স।

সে আবার কি?

বিশ হাজার থেকে চৌষট্টি তাও ফেরত।

হা-হা করে হেসে নগাদা বিদায় নিল। যাবার বেলায় বলে গেল, খবরের কাগজ আর পড়িস না, বুঝলি।

কেন।

আমাদের পরলোকযাত্রী, আঁধারীহাট আর টিস্‌ম্যাল, তিনখানা কাগজ পাশাপাশি রেখে দেখবি। আমাদের 'হাঁ', আঁধারীহাটে 'না' আর টিসম্যালে হাঁ-ও না, না-ও না। কোনটা আসল আর কোনটা মেকি বুঝে নেওয়া দায়। বুঝলি?

তার চেয়ে রেডিও ভাল।

হাঁ, হাত ওঠাও। মাথাটা সামনে দু ইঞ্চি নামাও। ডান পা-টা উঁচু কর। এবার বস।

ব্যায়াম কার্য শেষ হতে না হতেই রাষ্ট্রভাষা।

মেরে বাচ্চোঁ।

আর বাচ্চোঁ। বন্ধ কর সুইচ।

- এবার খবর পড়ছেন লচপ'চিয়া চক্রবর্তী।

দুত্তোর খবর।

জমির উৎপাদন শ'ক্তি বৃ'দ্ধি করুন। পল্লীবাসীর প্রোগ্রাম।

শুনবে কে?

বড় বড় জোতদার। হাজারে দু চার জন রেডিও বুকে করে শুয়ে থাকে। যারা উৎপাদন বৃ'দ্ধি করে তাদের সাথে রেডিও আর বক্তার যোগাযোগ আর হয় না।

বছর শেষে দেখা গেল উৎপাদন বৃ'দ্ধি পেয়েছে।

কত? এবং কিসের?

আর্টিস্ট পেমেন্ট, দপ্তর খরচা ইত্যাদি ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। রেডিও আর মাইকে তো ধানের ফলন হয় না। জমিতে হয়। জমিতো চাষীর নয়, জোতদারের জমিদারের আর বেনামদারের। তারা উদ্বৃত্ত ফসল খায়, চাষ

করে না। উৎপাদন ডালহৌসির কোনায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, গাঁয়ের জমিতে অত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়।

কপালে হাত দিয়ে বসল। তা হলে বিদেশী মুদ্রা ফুঁকে যাবে দেখছি। স্বদেশেই মুদ্রা নেই। বিদেশের মুদ্রা দিয়ে কি হবে ভেবে পায় না। গমের অর্ডার দিতেই হবে।

আঁধারীহাট জেহাদ ঘোষণা করেছে।

নারীধর্ষনের মামলা হলেই তা ফলাও করে ছাপতে হবে। সমাজকে বাঁচাতে হলে এসব অপকর্মের পাবলিসিটি দরকার।

জোয়ান মনে এসব মুখরোচক সংবাদ।

কাগজের কাটতি বাড়ে।

আলিনগরের খালের ধারে শহর গজায়।

মানুষ গজায়। রুটি গজায় না।

এ সংবাদ কেউ দেয় না।

খবর এসেছে মহা-মহারথী আসবেন সফরে।

সফরে যিনি আসবেন তাঁর প্রোগ্রাম তৈরী হল মহাকরণে।

যারা সম্বর্ধনা জানাবে তাদেরও তৈরী হল প্রোগ্রাম। প্রথম প্রোগ্রাম ট্রেনিং।

ট্রেনিং আবার কি ?

মহারথীকে অভিনন্দন জানাবার প্রস্তুতি। রিহার্সল সুরু হল। কোন সচিব কোন এঙ্গেলে দাঁড়াবে, কোন উপসচিব কি ভাবে পা ফেলবে, তার ট্রেনিং সুরু হল।

ডামি তৈরী হল। ডামিতে মালা দিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হল।

পীচের রাস্তায় পাঁচ ইঞ্চি বালি ঢালা হল। যান বহন নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা হল।

মুখ্য সচিব বাজেট শোনাল।

কত ?

সাঁইত্রিশ হাজার নশো তের টাকা উনসত্তর নয়াপয়সা।

এ শুধু ট্রেনিং-এর খরচা। সাতদিন রিহার্সাল দিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিল মহা-মহা-সচিব, উপসচিব।

আসল অভ্যর্থনার খরচ, সে অঙ্ক নাই বা শুনালাম। ট্রেনিং খরচাই যথেষ্ট।

সবাই বলল, মাননীয় অতিথি আসলে অঙ্ক হিসাব করে খরচ করা সম্ভব নয়।

নগাদা বলত, অঙ্ক পাবে খাদ্য বিভাগে। সুস্বাদু অঙ্কের মার প্যাঁচে খাদ্য উৎপাদন হয় এদেশে, শুধু যারা ভোজী তারা ভোজ পায় না।

তবে ব্যঙ্কের অঙ্ক অনেকেরই বৃদ্ধি পেয়েছে। সেটা কেউ দেখেও দেখে না, আর দেখে না শীর্ণ মানুষের দেহটা। ওসব দেখবার ফুরসত নেই। টনে টনে হিসাব দেবার ফুরসত রয়েছে আর রয়েছে শীর্ণ মানুষের ঠেঙ্গাবার ফুরসত।

নগাদা চুপে চুপে বলল, এ হল বুমেরাং। একদল হাতে ক্ষমতা পেয়ে আইন তৈরী করে গেল। ক্ষমতা হাত ছাড়া হওয়ার সাথে সাথে সেই আইনে ক্ষমতাচ্যুত মানুষের দল হাজতে রওনা হল। তবে কাউকে এ সব কথা বলিস না। বললেও আমার নাম করিস না। গোপনে দু একটা সুখ দুঃখের কথা বলি, বুঝলি!

নগাদা সব চেয়ে বড় বাস্তববাদী। তাকে ঘাঁটালেই বিপদ। নয়ত বেশ বলে চলেছে, উপভোগ্যতার বাস্তবতা।

নগাদা বলল, সত্যি কথা বললে ওরা রাগ করে। মিথ্যে বললে খুশী হয়। ওদের দল রয়েছে, দলের স্বার্থ ওদের সবার ওপরে, বুঝলি! এও একটা ব্যাধি। শুধু পারমিট লাইসেন্স নয়, কাব্য সাহিত্য সর্বত্র।

সাহিত্য সভা হবে।

চলল রথীরা।

যারা সাহিত্য কখনও খোলেনি, লিখতে কখন শেখেনি তারাই গেল মাতব্বরী করতে। মাইনে করা তোর-আমার মত মুখ্যু পুষছে, তারাই লিখে দিল বক্তব্য। মাতব্বর মহারাজ গড় গড় করে পড়লেন, হাততালি পেলেন। পেটোয়া কাগজওলার দল ফলাও করে সংবাদটুকু দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এহেন সাহিত্যরথীর জীবনী লিখে প্রচার করলেন।

এত বড় মহান লোক ভূভারতে কখন জন্মেনি। রবার্ট ব্রুস ছিলেন এর আদর্শ। তিন বারে প্রবেশিকা, চারবারে আই-এ, তারপর কমার্শে স্নাতক হলেন পরিণত বয়সে। জ্ঞানলাভের কি প্রবল ইচ্ছা। পুত্র এবং পিতা একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে পিতা পাশ করলেন। এ হেন একজন মহাপণ্ডিত ও সাহিত্যিক সভা শোভন করলেন। বাংলা দেশকে ধন্য করলেন। আসল কথা, গাঁটে পয়সা আছে ভাই, থাকলে তোকেও আমরা সাহিত্যিক করে দিতে পারি। রাতারতি মহারথী, বুঝলি!

নগাদা থামল।

পর্দার আড়ালে বসে যারা বুদ্ধি দেয় তাদের দক্ষিণা অতি সামান্য। ট্যাঁ-ফোঁ করলে আর রক্ষা নেই। এই যে আমাদের বাঘা বাঘা সম্পাদক ইংরেজি বাংলা হিন্দিতে সম্পাদকীয় লিখে দেশ উদ্ধার করেছেন, শুদ্ধ করে চিঠি লিখতেই এদের অনেকেই গলদঘর্ম। ভাড়া-করা মানুষের অভাব অনন্ত, কিন্তু ভাড়া করা মানুষের অভাব ওদের নেই, ট্যাঁকে নাকি গরমাগরম হালুয়া সব সময়।

বুঝলি ভাই, আসল হল রৌপ্য চক্র। তোর নেই, তাই গা কামড়াচ্ছিস ওদের আছে তাই গা গতরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নগাদা থেমে গেল।

তারপর।

তুই একটা স্টুপিড। তারপরে কিছু থাকে না, তার আগেই সব। জন্মভাগ্য, অর্থভাগ্য দুনিয়ায় সব কিছুই ভাগ্যের আগে আগে চলে। বুঝিলি।

আজ আবার রাস্তা চলা দায়।

শুধু 'চলবে না' 'চলবে না' ধ্বনি।

বাপের জুলুম চলবে না, পুলিশের জুলুম চলবে না, ফাঁকি দেওয়া চলবে না।

শুনলাম চলবে না, কিন্তু সবই চলছে তো অনবরত।

ধন্য গান্ধীজি।

গান্ধীর ব্যক্তিত্ব বাদ দিয়ে তাঁর নামকে ধন্য করেছে দেশের লোক, বিশেষ করে তার নিকট প্রতিবাসী মরুদেশের বন্ধুরা। অবশ্য হুজুররা তা স্বীকার করে না।

মারো গোলি চীনকো।

আরশুলা খেকো চীনারা নাকি সাড়ে বাইশ গজ জমি দখল করেছে, আর তেতাল্লিশ হাজার বর্গ মাইল জমি দাবী করছে।

সর্বনাশ।

পলাশী যুদ্ধের ভোঁতা তলোয়ার ধার দিচ্ছে হুজুরের দল।

রুখতে হবে।

কাকে ?

দেশের শত্রু যারা তাদের। আওয়াজ উঠল, রোখো চিনী, হটাও চিনি।

ভাল কথা। আমরাও হাত মেলাব। বাস্। রাতারাতি গুদাম খালি। একটাকার চিনি দেড়টাকায় বিকোয়।

ওরা বলল, চিনি খেলে কৃমি হয় তাই কণ্ট্রোল করা হচ্ছে। তা বুঝিস না ?

আসলে মানুষগুলো ক্ষেপে উঠেছে আর বলছে 'চলবেনা'। চলবেনা বললেই হল। কেমন রাতারাতি চালের দাম উপরে চালিয়ে দিলাম, ডালের দাম উপরে চালিয়ে দিলাম, চিনির দাম উপরে চালিয়ে দিলাম। চলবে না। ছোঃ।

বেকার মানুষকে সাকার করার নতুন রাস্তা নাকি পাওয়া গেছে।

কোথায়, কোথায় ? সবাই সরবে জিজ্ঞাসা করল।

মালবোঝাই লরি চালিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে গেলে বুঝবি।

দু মাইল চার মাইল পর পর পুলিশ পাহারা।

চার আনা ফেলে দে। ওরা ভদ্রলোক। নিজেরা নেয় না, রোয়াক থেকে ছোকরা ধরে আনে। তারাই পয়সা বুঝে নেয়। বার আনা চার আনা হিস্যা। দিন গেলে দশ টাকার হিস্যা আড়াই টাকা রোয়াকী ছোকরারা পায়, বুঝলি। নতুন এমপ্লয়মেণ্ট। আর লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হবে না। তার চেয়ে ঝুলে পড়, মোটেই মন্দ নয়। বেসরকারী এই নিয়োগকর্তারা শান্তির দূত। বলতে গেলে খাসা সাদা পায়রা।

আলিনগরের দখিণ পাড়া থেকে পশ্চিম পাড়ায় এসে দম ফেলবি। বুঝবি, টাকা তোর না থাকতে পারে তবে দেশে টাকার মোটেই অভাব নেই।

একটা দরখাস্ত লিখে দেবে ভাই ?

প্রশ্নকর্তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম, একখানা কেন দশ খানা লিখে দেব।

কথাটা মর্মে পৌঁছে গেল। বৃদ্ধ অধীরবাবু কেঁদে ফেললেন।

দাদা কাঁদছেন ?

কাঁদছিনা ভাই, এটা আনন্দের অশ্রু। আজ অবধি যার কাছে গেছি সেই ধমকেছে। তুমি শুধু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে, তাই আনন্দে কেঁদে ফেলেছি।

ওটা যে আপনার প্রাপ্য। অগ্নিযুগের মশাল ছিল আপনাদের হাতে। আপনাদের মশালের পেছন পেছন আমরাও এগিয়েছি, তাই না স্বাধীনতা। আপনারা যে চিরকালের নমস্য।

অধীরবাবুর ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল।

দরখাস্ত লিখে দিলাম।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি অগ্নিযুগের বিপ্লবী। বাস্তহারা। বয়স আশি বছর পেরিয়ে গেছে। গৃহহীন অবস্থায় পথে পথে ঘুরছি। বাস্তহারা-দের যে সাহায্য দেওয়া হয় সেই সাহায্য চেয়ে পাঁচ বছর আগে দরখাস্ত করেছিলাম। কিন্তু কোন ফল লাভ হয়নি। আজ ভাবছি, নিরাশ্রয় অবস্থায় খোলা আকাশের তলায় আমার মৃত্যু হবে। এই চিন্তা আমায় ব্যথিত করেছে। স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার সৈনিক অসহায়ভাবে মরলে ভবিষ্যত বংশধর মার্জনা করবে না। তাই প্রার্থনা জানাচ্ছি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বললাম, দাদা ফল কিছু হবে কি ?

হবেনা। তবুও যাক। মরতে দুঃখ নেই দামোদর কিন্তু অসহায়ভাবে মরব, একথা ভাবতে পারছি না।

ওকথা না ভেবেও মরতে পারবেন।

অধীরবাবু মারা গেলেন কিনা জানিনা।

তবে অগ্নিযুগ বায়ুযুগের সংঘর্ষে কালোবাজারের যুগ এসেছে। সে বাজারে মূর্খের মত ত্যাগ একটা বিভীষিকা মাত্র। অধীরবাবুকে যাবার বেলায় আবার প্রণাম করেছিলাম। কিন্তু তাতেও তৃপ্তি হয় নি।

শহর কোলকাতার নীচের তলায় তাকায় কে? হুজুররাই তাকাবে, যখন ভোট নিতে হবে। তখন প্রতিশ্রুতির অঙ্ক লিখবার মত স্থান খাতায় থাকবে না।

তোমার এলাকায় কয়টা গ্রাম?

তিনশো বার।

তিনশো বার ইণ্টু দুইশ' অর্থাৎ বাষট্টি হাজার চারশো। ডাকো সেন এণ্ড সেন কোম্পানীকে।

বুঝলে?

আজ্ঞে হাঁ। প্রত্যেক গ্রামে টিউবওয়েল হবে এই ধাপ্পা দিতে হবে। দুশো ফুট পাইপ লরী দিয়ে পৌঁছে দিতে হবে। ভোট যুদ্ধ শেষ হলেই আবার ফিরিয়ে আনতে হবে, এইতো।

ঠিক বুঝেছ। চাষাভুষোরা খুব খুশী হবে।

পরের বার?

সে পরে দেখা যাবে।

কিন্তু স্যার এবার লাখ কয়েক টাকার কণ্ট্রাক্ট না পেলে বউ ছেলে নিয়ে না খেয়ে মরব।

পাবে হে পাবে।

শেষে ঐ টিউবওয়েলের মত হবে না তো?

হুজুর ভ্রূ কুঁচকে চুপ করে বসে রইলেন।

তবে তাই করি।

কর।

সেন এণ্ড সেন কোম্পানীর প্রধান কর্তা ছুটল আড়াই ইঞ্চি ব্যাসের দুশো ফুট করে পাইপ সংগ্রহ করতে। কোথাও দুশো পৌঁছান, কোথাও একশত। ফলের কিন্তু তারতম্য ঘটল না। হুজুররা আবার হুজুর হয়ে বসলেন।

ভোটের শেষে পাইপ ফিরে গেল সেন এণ্ড সেন কোম্পানীর গুদামে ভোট দাতা চোখ মুছল। জল পেল না।

উনিশশো ছয় সালকে কোলকাতার লোক ভোলে নি। স্মরণ রাখতে বাগান গরেছে গড়ের মাঠে। নাম দিয়েছে কার্জন পার্ক।

পার্কের উৎপাতে আজকাল মানুষ বিশেষ করে ভদ্রমানুষ সেপথে সন্ধ্যার পর হাঁটতে সাহস পায় না।

মালিশ।

তেল মালিশ। মাথা মালিশ, পিঠ মালিশ, তারপর আর বলা যায় না। সামনে রাজ্যপাল থাকেন। দূরবীন থাকলে তিনিও দেখতে পেতেন।

সবাইতো থানায় যায় না, সবাইতো আদালতে যায় না। সুদণ্ড দিয়ে গোপনে ঘরে ফিরে আসে মহা মহা রথীরা। তারপর চুপচাপ। দুটো একটা খবর যা বাইরে আসে, সে-খবর সব খবরের য়্যাটোমিক ভগ্নাংশ।

ঐটুকু শুনেই এপথে সহজে কেউ পা দেয় না।

আর মিছিল হল্লা হলে, অন্ধকার ঝোপের তলায় লাঠি নিয়ে পুলিশ বসে থাকে। প্রাণের ভয়ে যারা পালাতে থাকে তাদের মাথায় বসিয়ে দেয় লাঠির চুম্বন।

স্থান মাহাত্ম্য।

অন্য সময় পকেটে লাঠি পড়ে, মিছিল হলে মাথায় লাঠি পড়ে।

দু দলের বিশেষ ফারক কোথাও আছে লোকে বুঝতে পারে না। অন্ধকারের নিশাচর ওরা সবাই।

ফিটন থাকে প্রস্তুত।

এই যে ঠিক পৌঁছে দেব।

পৌঁছাতে আর হয় না। মাঝ পথেই পকেট সাফ, প্রয়োজন হলে ইহকালের ভাবনা চিন্তাও সাফ।

যারা দেখবে তারাতো রাষ্ট্রভাষার স্ত্রীলিঙ্গ।

মানুষ খেতে চেয়ে হল্লা করলে ওরা সাময়িকভাবে পুং-প্রাপ্ত হয়। বাগান আর পাহারা অমর রইবে। তাই কার্জন সায়েব চিরকাল আমাদের স্মরণ পথে থেকেই যাবে। সামনে গেরুয়া পতাকার তলায় রাজ্যপাল হাওয়া খাবে। ফুটপাতে হাওয়া খেয়ে শীর্ণ মানুষ অক্কা পাবে। রাহাজানি আর সম্ভ্রমহানি বন্ধ আর হবে না। কার্জন সাহেব নিজের গরিমায় আরও দু চারশো বছর ময়দানের শোভা বর্দ্ধন করবে।

দখিণ পাড়ার বস্তি থেকে নতুন মানুষের এডিসন বের হচ্ছে। এরা নতুন ট্যাকটিস শিখেছে।

সন্ধ্যাবেলায় 'পাঠ' হয় কালী মন্দিরের চত্বরে। প্রবীনাদের ভীড় জমে আর ভীড় করে ছোট ছোট ছেলেরা। মাসী-পিসি পাতিয়ে ওরাও 'পাঠ' শোনে, লুটের বাতাসা খায়। নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে যায়। আজ যারা আসে, কাল তারা আসে না। শুধু কালকেই তারা আসে না এমন নয়, অনেক দিনের জন্যই তারা অদৃশ্য হয়। নতুন 'পাঠ' আরম্ভ হলে তবেই হয়তো আসে।

গিন্নীবান্নি মেয়েরা পাঠ শুনে বাড়ি ফেরে। সদরের তালা খুলতে আঁচলে হাত দেয়। লহমায় বুঝে ফেলে চাবির গোছার সাথে সাথে কিছু নিকেল-তাম্র মুদ্রাও অদৃশ্য হয়েছে।

ওসব গিন্নীরা সহজে আর আসে না। নতুন একদল তাদের স্থান দখল করে। তাদেরও আঁচল খালি হলে ওপথ মারায় না।

লোকে বলে আঁচল কাটে।

আঁচল না কাটলে সিনেমার লাইন দেবার পয়সা পাবে কোথায়? যেদিন আঁচল কাটার সুবিধা থাকে না, সেদিন গেরস্ত বাড়ির ঘটি বাটি লোপাট হয়। জায়গা বিশেষে গিয়ে দু টাকার জিনিষ ছয় আনায় বিকিয়ে আসে।

হাত পাকলে ট্রামে বাসে ভীড়ের মাঝে লুকিয়ে থাকে। নইলে থাকে রেল ষ্টেশনে, অসতর্ক যাত্রীর পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে নিঃশব্দে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

যারা নিত্যকার যাত্রী তারা বড় হুঁসিয়ার।

নতুন মানুষের গন্ধ পায় ওরা। দলপুষ্ঠ হলে ছুটতে হয় কম। ভারিক্কি যারা তারা তালিম দেয়। তীর ছেড়ে দিয়ে তীরের গতি লক্ষ্য করে। বেসামাল বুঝলে গা ঢাকা দেয়।

শহর কোলকাতার মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তবুও মাঝে মাঝে কোলা-

হল শোনা যায়। আবার যেমনকার তেমন, নিস্তব্ধতা নেমে আসে মনের কোনায়।

আলিনগরের খাল ভরাট হবে। সরকার হুকুম জারি করেই খালাস। রেল লাইনের ধার বেয়ে নতুন বস্তী বসেছে। এ বস্তীর বাসিন্দা কাজ খুঁজে পায় না। কাজের আশায় অনেক দিন লাইন দিয়ে হয়রাণ হয়ে ঘরে বসে বসে জীবন যাত্রার পথ খোঁজে।

বেকার লোকের দল দাঁড়িয়েছ দুটো।

একদল কয়লা পার্টি আরেক দল ছিনতাই পার্টি।

গনশা কয়লা পার্টির সরদার। টনে টনে কয়লা পাচার করে দিব্য ছিল সুখে। মাঝে মাঝে ওয়াগনের তালা ভেঙ্গে উপরি রোজগারও হত। ঝুনঝুনি-টুনটুনিদের সাথে হাত মিলিয়ে বখরা মন্দ হত না।

ছিনতাই পার্টির সহ্য হল না।

বলল, শালারা ছ্যাঁচ্ড়া।

কি! ছ্যাঁচড়া! দেখবি মজা।

সুরু হল লড়াই।

মানুষের জীবন হল অতিষ্ঠ।

হুজুর দরবারে দরখাস্ত পড়ে গণ্ডায় গণ্ডায়। হুজুরদের ঘুম আর ভাঙ্গে না। ছিনতাই পার্টি ভোট দিয়েছে, ভোটের ক্যানভাস করেছে। তাদের সাত খুন মাপ। খুন মাপ করলেও মহল্লার মানুষ শুনতে চায় না। অবশেষে লাঠোর্দ্দি এল। কয়লা পার্টির বাছা বাছা চাঁইদের আটক করল। থামল যুদ্ধ। পাড়ার লোক নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

কিন্তু থামল না ছিনতাই।

বাধা পেল কয়লা পাচার।

ছিনতাই পার্টি বুক ফুলিয়ে চলে।

কয়লা পার্টির দলে ঘুণ ধরে।

সে আর কদিন। গনশা ফিরে এসেই নামল লড়াইয়ে। আবার পড়ল দরখাস্ত। দরখাস্ত ফাইল চাপা রইল কিছুকাল।

একদিন প্রভাতে।

খবর এল রেল লাইনের ধারে কয়লা পার্টির দুজন গুলী খেয়ে মরেছে। ওয়াগন ভাঙ্গছিল। রক্ষীবাহিনী গুলী করে শেষ করেছে দুজনকে।

ছিনতাই পার্টি হাসল!

কয়লা পার্টি চুপ করে থেকে হঠাৎ ঠিক করে ফেলল, শোধ নিতেই হবে।

শোধ নেবার সাক্ষ্য দেবে কে!

আলিনগরের খালের ধারে নতুন মানুষের দল ঝিমিয়ে গেছে। তারা চোখ বুঁজে থাকে। সংসারে নতুন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই ওরা খুশী। বাইরে যে মস্ত বড় দুনিয়া আছে সে কথা ভুলেই গেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি রুটির চিন্তায় পথে পথে ঘোরে, মেয়েরা ঠোঙ্গা বানায়, কিশোর কিশোরী ঠোঙ্গা নিয়ে বাজারে বিকিয়ে আসে।

খালের ধারের মানুষ ঝিমিয়ে ওঠে দিনের পর দিন।

খাল ভরাট হলে নতুন শহরের পত্তন হবে। আরও নতুন মানুষ আসবে। তাদের সঙ্গে তাল ঠুকে চলবার মত মানুষ দিনের পর দিন কমতে থাকবে। কয়লা পার্টির লড়াই থামবে, ছিনতাই পার্টি পথ খুঁজবে পালাবার।

সবই বুঝি স্বপ্ন।

নগাদা বলে, স্বপ্ন নয় রে, এসবই বাস্তব।

আগে ভাবতাম শহর কোলকাতা বুঝি সরস মানুষ সৃষ্টি করে। এখন দেখছি, রসময় মানুষ সৃষ্টি করছে।

বলিস না দুঃখের কথা।

সেদিন গেলাম খেলা দেখতে। মোহামেডানের সাথে রাজস্থানের খেলা। মাঠে পা দিয়ে বুঝলাম আজকের খেলা জমবে ভাল।

দু জন গলাগলি ধরে যাচ্ছিল। পেছনে চলছিলাম আমি।

একজন বলল, পাকিস্তানসে আমির আগিয়া।

কেয়া বাত, উত্তর দিল অপরজন, য়্যাসা হোনে সে শালা লোক ঠিক রহেগা। মোছলমান, উস্‌সে বড়া পাকিস্তানকো মোছলমান, জান্‌তা নেহি।

অর্থাৎ।

অর্থাৎ পাকিস্তানের খেলোয়ার এইটেই তাদের আনন্দ। নাড়ীটা কোথায় বাঁধা বুঝলাম। হুজুররা বোঝে না, এই যা দুঃখ। না বুঝবার কারণ, ঐ ভোট। দরাজ হতে ওরা হুজুরদের ভোট দেয়। ওদের সাতখুন মাপ।

সাত আনার টিকিট কেটে জায়গা করে নিলাম ওদেরই পাশে।

সুরু হল জোর খেলা।

সত্যি বলতে কি, আমির খেললোও খুব চমৎকার। দেখবার মত খেলা। পাশের লোককে ফিস্ ফিস্ করে বললাম, আমির বেশ খেলছে।

বন্ধু একবার আমার বেশভূষা দেখে নিয়ে উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, আমির খেলেগা নেহি তো তেরা বাপ্ খেলেগা।

নগাদা বলতে বলতে থেমে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর ?

তুই একটা আস্ত স্টুপিড্। তারপর কি কিছু থাকে। মুখ খুললেই পাইকিরি হারে চাঁটি পড়ত মাথায়, পকেট সাফ হত, শেষে ন্যাড়া মাথায় ছেঁড়া জামায় বাড়ি ফিরতে হত। বুঝলি।

নগাদা আর খেলা দেখতে যায় না। বললে বলে, যেদিন প্রেসকার্ডটা কব্জায় পাব সেদিনই যাব। তবে মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের খেলা হলে মোটেই যাবে না।

মানে ?

মানে আর কি ! পিতৃদত্ত মস্তকটি তো আর পাথরে ঠুকে গুঁড়ো করতে পারি না। তাই ওপথে কখন হাঁটি না। খেলছিস তো বেনামদার পার্টির হয়ে আর ইট পড়ছে দর্শকের মাথায়। একেই বলে মুর্খের রাজ্য।

বললাম, নগাদা কোলকাতা শহরে রাস্তায় পা দিতে হয় লাইফ ইনসিওর করে। এখানে অত ভয় পেলে কি হয়।

ভয় মোটেই নয়। আজকাল রাস্তায় শুধু লাইফ ইনসিওর করে বের হতে হয় এমন নয়, বুঝলি ? ঘরে বসেও ছাদ ভেঙ্গে পড়ে। পৌরবাবারা ভাঙ্গা বাড়ি মেরামত করাতে পারে না, ভাঙ্গা বাড়ির ভাড়াটিয়া ইঁট চাপা পড়ে মরে। তা বলে জেনে শুনে মাথা ফাটাতে কে রাজি হয় বলত। ওরা খেলা দেখতে যাবার আগেই পকেটে পাথর নিয়ে যায়। পাথর সাপ্লাই দেবার এজেন্ট নাকি

আছে। এক আনায় দেড় গণ্ডা পাথর টুকরো নাকি কার্জন পার্কের গেটে বিক্রি হয়, বুঝলি।

নগাদাকে ক্রিকেট খেলা দেখতে যেতে দেখেছি। ফুটবলের মাঠে দেখিনি।

খেলার মাঠেও কয়লা পার্টি আর ছিনতাই পার্টির ক্ষুদ্র সংস্করণ। কেউ আশা না করলেও আজব বাংলায় তাও সম্ভব।

নগাদা বলল, সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেছে হে। নইলে মানুষ এত বদ মেজাজী জঙ্গী হতেই পারে না। প্রথম, ভাল খেতে পায় না, যা খায় তা হজম হয় না। যার ফলে মেজাজ থাকে তিরিক্কে; দ্বিতীয় সংসারী জোয়ান ছেলে নববধূর মুখ ঝামটা খেয়ে মাসল্ কণ্ট্রোল শেখে। তারই বাস্তব রূপ দেখা যায় খেলার মাঠে। তাই কেউ মোহনবাগান আর কেউ ইষ্টবেঙ্গল। অর্থাৎ ছিনতাই আর কয়লার নতুন চেহারা।

একদিন এমন দিন ছিল, বুঝলি? —সেদিন বাংলার খেলোয়ার দেখলে সারা ভারতের মানুষ শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করত। আজকে পুরোপুরি বাঙ্গালী টিম আর 'এ' ডিবিসনে খুব কমই খেলে। সবই বেনামদারীতে টিম চালায়। বুঝলি। তাই শ্রদ্ধা উপে গেছে, রয়েছে শুধু মূর্খের অহমিকা। তাই ধাক্কা ধাক্কি করতে ওদের লজ্জা হয় না। আমরাই লজ্জায় মরি।

তারপর রাতটা পেরোলেই হল।

কেউ আঁধারীহাট, কেউ পরলোকযাত্রী কাগজ নিয়ে রোয়াকে বসে যায়। খেলার মাঠে যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু আরম্ভ হয় রোয়াকে। রাস্তা দিয়ে শান্ত মানুষ চলবার আগে থমকে দাঁড়ায়। এই বুঝি লাগল।

এখানেও দুটো পার্টি।

তুই কি?

মোহনবাগান।

বলিস কিরে তুই হলি খাঁটি ঢাকার লোক।

হলেইবা কি হয়। আমি বাপু ট্রাডিশ্যানাল লোক। মোহনবাগানের ঐতিহ্য রয়েছে। ভুঁইফোড় নয় ওরা।

তাহলে বলতে চাস, ইষ্টবেঙ্গল ভুঁইফোড়।

তাতো বলিনি।

না বললেও, ওর অর্থ ঐ। একটু মুখ সামলে কথা বলিস।

তুইও মুখ সামলে কথা বলিস।

আরে তোরা করিস কি, শেষে মারামারি করবি নাকি ?

থামল দু জন।

আরও দু জন রণক্ষেত্রে এসে দাঁড়াল।

রহমান যেমন ভলি মেরেছিল ওরকম কখনও কেউ মারেনি।

ছোঃ। মেরুলালের কাছে রহমান। কিসে আর কিসে, ধানে আর তুষে। কোথাকার রহমান, কলাবাগানে বিড়ি বাঁধে আর কোথাকার মেরুলাল থার্ড কোম্পানীর অফিসার। যেমন তুই তেমনি তোর রুচি।

প্রথম বক্তা থামতে বাধ্য হল। স্বপক্ষে ভোট পাবার আশা কম।

ওদিকে কলাবাগানে তখন বাজি পোড়াবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

ওহো, আমির য়্যাসা খেলিস্ ওহোঃ।

উসকো দাওয়াত দো। খাস পাকিস্তানী জানতা হ্যায়। পাকিস্তান মে আসলি আদমি পয়দা হোতা হ্যায়। আরে উসমান, দোঠো পান লে-আতো। দে বে একঠো বিড়ি দে।

জমানামে য়্যাসা নেহি হুয়া।

ছোর্ দে ইয়ার। মুছলমান বাদশাহ কা জাত্ মোছলমানকো সাথ দিল্লাগি। ছোঃ। দে বে একটো বিড়ি দে।

এপাড়া ওপাড়ায় রোয়াক গুলজার।

দখিণ পাড়ার লোক সরেস বেশী।

তারা নিজেরা মারামারি করে কাঠগড়ায় দাঁড়ায় আবার খেলোয়ার ঠেঙ্গিয়ে খেলার মান উন্নত করে।

নগাদা বলেছিল, এও একটা রোগ। এ রোগের মূল হল জাতির চরিত্র গঠন না হওয়া। সবাই যদি ভাবত এদেশ আমার দেশ, এদেশের সুখ দুঃখ আমাদের সুখ দুঃখ, এদেশের মর্যাদা আমাদের মর্যাদা, আর মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব আমাদের, তাহলে এই ছেঁড়া কাজে কি মানুষে মেতে উঠত! হুজুররা

এসব শেখায় নি, শেখাবার চেষ্টাও করেন নি, তারা জানে ওরা মানুষ হলে হুজুরদের ভোট দেবে না, তাই শেখাবার গরজ নেই। সকাল বেলা থেকে কানের কাছে শুনতে পাবে, হাত তোল, আর পা তোল, না হয় শুনবে, রাষ্ট্রভাষা শিখ্না হামারা ফরজ্ হ্যায়। মরুকগে এই যাত্রা দলের রাজা-বাদশা। কোন-দিন ভীমের গদা ফেটে পেঁজা তুলো বেড়িয়ে পড়বে। সেদিন হুজুররা বুঝবে।

শিখবে কি করে। যারা শিখবে তারাও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, যারা শেখাবে তারাও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। অধ্যাপক আর পাঠক উভয়ের আধপেট খালি। পড়া ও পড়ান আর হয় না।

এখানেও দুটো দল।

একদল পড়ুয়া আরেক দল বেড়ুয়া অর্থাৎ বেড়িয়ে বেড়ায়।

অধ্যাপক মুখ নীচু করে নাম ডেকে দেখলেন দুশো জন হাজির। হয়ত হাজিরা লিখলেন আড়াই শত জনের। পড়ানো শেষ করে মুখ উঁচু করে দেখলেন শতে দশ জন বসে রয়েছে, বাকী সব পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

পড়ুয়ার শতকরা হিসাব পাওয়া গেছে, বেড়ুয়ার শতকরা হিসাব পাওয়া গেছে। অধ্যাপক অধ্যাপনা শেষ করে ফিরে গেছেন। পাঠ গ্রহণ করল কাঠের আসবাব। রক্ত মাংসের মানুষ নিরাপদে দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

বেড়ুয়ার দল ততক্ষণ দল বেঁধে কফি হাউসে অথবা কমনরুমে ইউনিয়নের মহরা দিচ্ছে। অনেক দূর জনপদ থেকে এসেছে অনেকেই, তাদের বেঞ্চের ভাড়া দিচ্ছে আশাবাদী পিতামাতা। আর দুটো বছর। দু বছর পর জয়পত্র নিয়ে পুত্র অথবা কন্যা ঘরে ফিরে আসবে। পিতামাতা দিন গুনছে, ঘরের ঘটিবাটি গয়নাপত্র বিক্রি করে খরচ জোগাচ্ছে। কষ্টসাধ্য এই পয়সার অংশ সবার অলক্ষ্যে কফি হাউসের মালিকের পকেটে উঠেছে, সিনেমার মালিকদের পকেটেও।

কেউ জয়পত্র পেল, কেউ পেল না। যারা পেল, জীবিকার পথ তারা হয়ত বা পেল না। বিরাট বিরাট বহু হাজারী মনসবদার অথবা সুবাদার বাণী শোনাল। জয়পত্র নিয়ে ঘরে ফিরে এসে বিধবা কন্যার মত পিতামাতার স্কন্ধে চেপে বসল।

তারপর।

বড় জোর ইস্কুল মাষ্টারি, না হয় কেরাণীগিরি। অবশ্য পথ কোথাও উন্মুক্ত নয়। তবুও হয়ত স্থান সংগৃহীত হল দু চারজনের।

কলেজের গন্ধ যতদিন গায়ে ছিল ততদিন সংস্কৃতি সভা করল, হুজুরদের ছাতা গামছা ঘাড়ে নিয়ে বেড়াল। তারপর একদিন ভাতের চিন্তা ভালভাবে দেখা দিতেই নিউ নেশ্যান গড়বার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। অর্থ উপার্জ্জনের পথে পা ফেলবার আগেই চোখে পড়ল গ্রেট মোগলদের গোষ্ঠী পথ আটকে বসে রয়েছে।

নগাদা বলত, সে কথা আর বলিস না। আমার পিসতুতো বোনের দেওর এম-এ পাশ কি ফেল করে মাষ্টারী করতে গেল। বেতন সে কথা আর বলিস না। বিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগেও যখন কলকাতার মত শহরে একশ টাকা পেয়ে দেড়শ টাকার রসিদ দিয়ে মাষ্টারী করতে হয় তখন আর গ্রামে কি হয় বুঝতেই পারিস। তখন সরকারী ভাতা ছিল দশ টাকা, বেতন ছিল ছিল তিরিশ, কাগজে লিখতে হত তার চারগুণ। নইলে চাকরি থাকে না, ইস্কুলও থাকেনা। ইস্কুল না থাকলে দেশের লোক মুখ্যু থাকে, পরিচাল-করা লাঠি ঘোরাতে পারে না, দল জোটে না, অতএব ইস্কুল চাই। আর চাকরি থাকলে ফাউ পাবার আশা থাকে। অতএব চাকরি চাই।

একশ কুড়ি টাকার বদলে তুমি চল্লিশ টাকা পাচ্ছ। বাকি আশি টাকা জমা হচ্ছে দানখয়রাত খাতে কিন্তু দাতা তুমি নও, দাতা সেক্রেটারী অথবা প্রেসিডেণ্ট।

বাংলাদেশের ইস্কুলগুলো গরীব মাষ্টারদের দানেই গড়ে উঠেছে। একথা কেউ স্বীকার করে না। কাগজে কলমে দাতার অভাব নেই, কিন্তু আসল দাতা আর নকল দাতা খুঁজে নেওয়া যা কঠিন।

আমার বোনের দেওর চাকরি পেল। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে টুইশানি, দুপুরবেলায় চাকরি, রাতে ঘুমোবার আগেও টুইশানি। অঙ্ক কষে দেখা গেল, দুপুরবেলায় ক্লাশের চেয়ারে বসে শ্রীমান ঘুমোন, কেননা অতি পরিশ্রমের জন্য বিশ্রাম দরকার। কোন সময় ছেলেরা বিরক্ত করলে বলত, চল্লিশ টাকায় এর চেয়ে ভাল পড়ান হয় না।

ইস্কুলেই ছেলেরা শিক্ষকদের কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়ে এল। অপরাধ যে কার তা ভেবে দেখ। শ্রীমানের দুরবস্থা মোচনের ব্যবস্থা

হুজুররা করেন না। তাই শ্রীমানদের মত শিক্ষকদের যাঁতাকলে যে ছাত্র তৈরী হয় তাদের দিয়ে আশা করবার মত কিছু থাকেও না।

নগাদাকে বাধা দিয়ে বললাম, শ্রীমানের উচিত ছিল চাকরি ছেড়ে দেওয়া। যে কাজের সে যোগ্য নয়, সে কাজ করা উচিত নয়।

নগাদা ধমকে উঠল। শুকনো পেটে যোগ্যতা শুকিয়ে যায়। বুঝলি। তোর হিসাব মত যোগ্য লোক খুঁজতে গেলে বাংলা কেন সারা ভারতেও একটা খুঁজে পাবি না। যাওবা কিছু শিখেছে তাও শেখা হত না। তবে জানিস, এ শেখার চেয়ে না শেখাও ভাল। ভাল করে শিখে এসে হুজুররা বললেন, তোমারা দাও সাড়েসতর আমরাও দেব সাড়েসতর। হুজুর কি জানেন না, যে মিথ্যা দশ টাকায় আগে যারা সই দিয়ে সরকারী দশ টাকা পেয়েছে, তারাই শুধু অঙ্কটা বদলে সই দেবে। আসল কথা, যে দেশের হুজুরা হয় মুখ্যু না হয় অন্ধ সে দেশের মানুষ হয় চোর না হয় জোচ্চোর। পরিচালকরা স্বেচ্ছায় যখন মিথ্যা বলে, শিক্ষকরাও তখন মিথ্যা পথে পা দেয়। আশ্চর্য হবার কি আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি গুনে, কফি হাউসের টফি খেয়ে যারা আশা উৎসাহ নিয়ে ফিরে এসেছিল তারা ধাক্কায় ধাক্কায় যখন বুঝতে শেখে পয়সা ধর্ম, পয়সা কর্ম, পয়সা হি পরমন্তপঃ তখন ন্যায় নীতিবোধ আপনা থেকেই লোপ পায়।

শহর কোলকাতায় শিক্ষককুল বাঁচুক আর না বাঁচুক তাদের সৃষ্ট ছাত্রকুল যে আর বাঁচবে না এ কথা হলপ করে বলা যায়।

আলিনগরের খালের জলে আজও জোয়ার ভাটা খেলছে। আজও দুপাশের বাসিন্দাদের জীবনে জোয়ার ভাটা খেলছে। পরিবর্তন কোথাও নেই।

আলিবর্দীর দুলাল যদি জানত, তা হলে ছুটে আসত না কোলকাতার বনবাদারে। মুর্শিদাবাদের আমবাগানে প্রজাপতি ধরেই বেড়াত।

আলিনগরের খালের ধারে মানুষ মারার কল পেতেছে সায়েবরা। সায়েবরা যাবার বেলায় কালো সায়েব রেখে গেছে, কল আর বন্ধ হয়নি।

কলের চাকায় মানুষ গুঁড়িয়ে যাচ্ছে নিত্য।

হুজুরে আবেদন করছে, হুজুর মাইনে বাড়াও।

চাল তিরিশ টাকা।

ডাল পঁয়ত্রিশ টাকা।

পোষ্য নয়জন।

ষাট-সত্তর টাকায় ডাল-ভাতও জোটে না। বাড়ি ভাড়ার দায়ে বছরে তিনবার উচ্ছেদের মামলা লড়তে হচ্ছে।

হুজুর বলল, জাপানে ষোল শত ক্যালোরিতে মানুষ বাঁচছে। পেট ভরে ভাত খেলে বার শত ক্যালোরি, কিছুটা ডাল খেলে তিন শত ক্যালোরি আর বাকীটা শাক পাতায় পূরণ হবে। অত ভাবছ কেন, বেশ আছ। বেঁচে আছ, বেঁচেই থাকবে।

হিসাবটা বুঝতে না পেরে রঘুয়া চুপ করে রইল।

জানতা হ্যায় জাতিকা জনক ছয় পয়সাকা খানা খায়া।

জি হুজুর।

আর তোমরা তো পুরো ছয় আনার খানা খাতা হ্যায়।

জি হুজুর, লেকিন আপ লোক?

হুজুর হাসল।

আমি হুজুর, আমার মান মর্যাদার স্ট্যাণ্ডার্ড রাখতে হয়, ছোটাছুটি করতে হয়। মাসে চারহাজার রূপেয়া না হলে আমার চলে?

তা হলে হুজুর, আমারও চারশ রূপেয়া না হলে কি করে চলে।

বেওকুফ।

চার্জসিট দাও হে অবনীলাল।

ইয়েস স্যার।

রঘুনন্দন চাকরি হারিয়ে পথে পথে ঘোরে। সমব্যথীরা বলল, নালিশ কর।

রঘু ঘটি বাটি বেচে আদালতে গেল।

তারপর।

পাকা চার বছর। আপীল—হিয়ারিং শেষ হবার আগেই রঘুনন্দন পাতিপুকুরের সিঁড়িতে হাঁপাতে হাঁপাতে একেবারে আপীল আদালত ছেড়ে অনেক দূর পৌঁছে গেছে।

হুজুর হাসল।

কিসে আর কিসে, ধানে আর তুষে। আমার চার হাজার বলে তোরও কি চারশো হবে। ছোঃ। হুজুর এক পেগ গলায় ঢেলে দিলেন।

আলিনগরের মানুষ রঘুয়ার কথা ভাববার অবসর পায় না।

হুজুররা অর্থনীতির পাতা উল্টায়।

বাজারে অভাব সৃষ্টি করে দাও। এক।

বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে দাও। দুই।

টাকার দাম কমিয়ে দাও। তিন।

তারপর।

শ্রমের মূল্য কমে যাবে। এক।

উৎপাদন কমে যাবে। দুই।

অল্পব্যয়ে বেশি লাভ হবে। তিন।

অর্থনীতিবিদরা মুচকি হাসল।

হুজুরকে বলল, খাসা ব্রেন।

আলিনগরের খালের ধারে চিমনি থেকে ধুঁয়ো বের হয়। শীতের সন্ধ্যায় জমাট ধুঁয়োতে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। হাঁপাতে থাকে মানুষ।

হাঁপাতে হাঁপাতে আজও মানুষ মারার কলে ওরা এসে হাজির হয়।

তারপর।

হয় গোবরায় না হয় নিমতলায়।

মানুষ বুঝি আর বাঁচেনা।

নগাদা বলল, নিশ্চয় বাঁচবে। বাঁচবে ঠিকই। না বাঁচলে ফ্যামিলি প্ল্যানিং হত কি কখনও। তবে প্ল্যানিং আর দরকার হবে না। ছেলেরা বেকার, মেয়েরাও বেকার। বিয়ে করতে চায় না কেউ-ই। শিশু যারা আসবে তারা খালের জলে ভাসবে, না হয় ঢাকা পড়বে ডাস্টবিনের জঞ্জালের তলায়। নতুন করে শক্ত সমর্থ মানুষ আর জন্মাবে না। এইটেই বড় প্ল্যানিং। বুঝলি।

এসব কথা কাগজে ছাপা হয়না কেন ?

তুই একটা আস্ত গাধা। ষ্টুপিড। হুজুরদের জো-হুকুম করতে হয়। মোটা হাতে বিজ্ঞাপণ আসে সেটা বুঝি জানিস না। আঁধারীহাটকে নগদা-নগদ দিয়েই রেখেছে। হুজুরদের বিরুদ্ধে কিছু বলবার এক্তিয়ার কারুরই নেই। টাকা এমন যন্তর যে ওখানে ট্যাঁ-ফুঁ করলেই রুটি রুজি বন্ধ।

নগাদা ব্যস্তভাবে চলে যাচ্ছিল। থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, অত ব্যস্ত কেন নগাদা ?

আর বলিস না, ঐ প্ল্যানিং। আমাদের বাপ দাদা প্ল্যানিং এর কথা কখনও ভাবেনি এখন আমাদের ভাবতে হচ্ছে। ষাটের দয়ায় এগারটি। বুঝলি তো। গিন্নী কুপোকাৎ, আমার পকেট গড়ের মাঠ। তাই ছুটছি। তবে ছুটে লাভ নেই। মানুষ যখন জন্মায় তখন দুটো আর্জ থাকে, প্রথমটা বাঁচা, দ্বিতীয়টা বংশবৃদ্ধি করা। তারপর ঘর-বাড়ি অন্য কিছু। শুধু মানুষ কেন, দুনিয়ার সব কিছুতেই এটা পাবি। কিন্তু বাঁচা যখন সমস্যা তখন বংশবৃদ্ধি আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। ভাল রেটে অখাদ্য খাওয়াতে থাকলে তাজা মানুষও শীগ্‌গীর পটল তুলবে তখন আর প্ল্যানিং এর দরকার হবে না। আরে ছোঃ। গাঁয়ে কখনও গেছিস। দেখবি চাষের সময় হাজার হাজার বিঘে পতিত হয়ে আছে। সে জমি চাষ হয় না। ভাগীদার ভাগ নেয়, তা সহ্য হবে কেন। জমিদার জোতদার আর বেনামদারের উৎপাতে জমি পতিত থাকে। সে সব জমিতে চাষ হলে দশের পেট ভড়িয়েও বিদেশে চালান দিতে পারতি। তা না প্ল্যানিং কর। কর।

বললাম, আইন করে এসব বন্ধ করতে তো পারে।

তুই একটা আস্ত গাধা। হুজুরদের গাঁট বাঁধা রয়েছে ওদের সাথে। আর হুজুরদের দলেও ওরা রয়েছে কয়েক গণ্ডা। দল রাখি না দেশ রাখি। দল থাকলে চাকরি থাকে। তাই হুজুররা চোখ বুজে আছে। অনেকটা তুরীয় ভাব। বুঝলি।

এই দেখ, জমিদারী বাতিল। সর্বত্র। কোলকাতায় নয়। কেন নয়। আরে মাথা মোটা কোলকাতার জমিদার হটাতে গেলে হুজুরদের চাকরি থাকে না। একথাটা বেশ বোঝে তাই দিব্য আরামে কোলকাতার বুলবুলির লড়াইয়ের বাবু-জমিদাররা গা গতরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হাঁ নমস্য জন, একমাত্র চার্ণক। তাকে দুহাততুলে প্রণাম করিস। মঘা অশ্লেষা দেখেই চার্ণক সাহেব কোলকাতার জমিতে কদম রেখেছিল। নইলে এত গুণে গুণবান হতে পারত কি কেউ? বুঝলি?

যদি কিছু শিখতে চাস তাহলে ইংরেজের পাঠশালায় যাবি। আমাদের বড় বড় হুজুররা ইংরেজের পাঠশালা থেকে পড়ে এসেছে। তাই বুদ্ধিটা বড়ই পাকা। আর তোরা সেই অনুপাতে নিরেট।

দেখিস না, কেমন ইংরেজী কায়দায় হুজুররা লাঠি পেটায়। কেমন ইংরেজী কায়দায় প্রচার করে, লোকটা না খেয়ে মরেনি, পেটের পিলে ফেটে মরেছে। কেমন ইংরেজি কায়দায় বক্তৃতা দেয়, দেশের লোকের সেবক পুলিশ, কাজের বেলায় পুলিশের সেবা করে দেশের লোক।

বড় বড় হুজুররা চোগা চাপকান যাই পড়ুক আসলে তারা চোদ্দ আনা ইংরেজ আর দু আনা দেশী। সে দু আনা ঐ পোষাকে আর কথাবার্তায়। নইলে বিলিতি গন্ধ ওদের সব কিছুতে। ইংরেজ জানত, divide & rule, এরাও জানে সেই মন্ত্র। দেখছিস না কতগুলো দল বেঁধেছে সারা দেশে। দলগুলো আছে বলেই তো হুজুররা দেশসেবা করছে।

আর দলের কথা বলিস না। পাঁচজন, শুধু পাঁচজন হলেই দল। দু জন ফেষ্টুন নিয়ে দাঁড়াবে, একজন চোঙা ফুঁকবে আর একজন থাকবে সেক্রেটারী আর একজন প্রেসিডেণ্ট। বাস্। মস্ত দল। কাগজওলার সাথে জানাশোনা থাকলে রাতারাতি পপুলার পার্টি। এদেশের কপালে সাধেই কি নুড়ো জেলে দিয়েছে ইংরেজ।

পোড়া কপালে মানুষের এর চেয়ে বেশি কখনও হয় কি। বুঝলি।

কোলকাতায় সকাল কখন হয় আর রাত কখন হয়।

একথা আর জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই।

রাস্তার বাতি যখন জ্বলে, তখনও রাত হয় না। ঘড়ির কাঁটা বারটার ঘর পেরিয়ে গেলে গাড়ি-ঘোড়া চলা কমতে থাকে। তখন রাত আসবার লক্ষণ দেখা যায়।

দুটো বাজলে নিশুতি নেমে আসে। রাত বোধহয় তখনই হয়।

চারটে বাজতে না বাজতেই তোড়জোড় শুরু। নতুন দিনের পত্তন হয়। ক্যালেণ্ডারের ডেটকার্ড বদল হয়।

কোলকাতার রাত দু ঘণ্টার রাত।

উপকণ্ঠ থেকে সওদা বোঝাই গাড়ি আসে। ব্যস্ততা বাড়তে থাকে।

ভাসমান জনস্রোত নামতে থাকে শহরের বুকে।

বোঝাই গাড়ির মানুষদের ঝিমুনি ছোটে।

তারপর।

এই যে দাদারা, এতটা যাবেন, একবার পরখ করে দেখুন। বাড়ি পৌঁছালে খোকাখুকুরাও বলবে, চাঁদমনির চানাচুর কোথায় বাবা! তখন কি জবাবটা দেবেন বলুন দেখি। ফেরবার পথে এক বস্তা চাঁদমনির মিষ্টি, ঝাল, টক-নোনতা চানাচুর নিয়ে যেতে ভুলবেন না।

থামল একজন।

আবার সুরু হল।

দাদুদের কাছে আর পরিচয় দিতে হবেনা। হাতকাটা তেল। এই রাস্তায় আজ দশ বছর কাজ করছি। সবাই চেনেন। বড় বড় বক্তৃতা দিলেই মাল ভাল হয় না, ফলেন পরিচিয়তে।

গাড়ি দাঁড়াল উল্টাডাঙ্গা।

মাত্র একবার, একবার পরখ করুন। কোবরাজি লজেন্স। আনায় চারটে, পয়সায় একটা।

ভ্রাম্যমান চিকিৎসকের ওষুধ, বস্ত্র, খাদ্য, মনোহারী দোকানের ভীড়। রুগী হলে ফলেরও অভাব নেই। এদের ভরসাতেই লাখ লাখ মানুষ কোলকাতায় আসে শেয়ালদা আর হাওড়া পেরিয়ে।

আর যাসনা। দমদমে মোবাইল।

দমদমে মোবাইল?—হঃ, আমাগো ধরব না।

বাবুদের বেছে বেছে ধরে বুঝলি। কোটপ্যাণ্ট পড়া বাবুরা হল ডব্লু-টি। আমরা তো পুষ্যিপুত্তুর।

তা বটে। আজ নাকি কাউকে বাদ দিচ্ছে না।

কস্ কি। আজ তা'লে খামু কি?

বাতাস।

তোর যা কস তাই বুঝি সাচা।

জানালার ফাঁকে হাত দিয়ে ঝুলতে ঝুলতে এক কামরা থেকে আরেক কামরায় এগিয়ে গেল।

দমদমে লাইন ক্লিয়ার নেই। গাড়ি থেমে গেল। ঝপাঝপ্ নেমে পড়ল রাস্তার ধারে। বেনে জলে ভেসে আসা মানুষের দল, আইনের পরোয়া নেই।

ফিরতি গাড়ি বোঝাই হয়নি তখনও।

কটায়? জিজ্ঞাসা করল একজন।

পাঁচটা আটান্ন।

পাঁচটা বাইশ এখনও ছাড়েনি। সেটাতেই চল।

একটা নয়া পয়সা দিন বাবু। ছদিন খাওয়া হয়নি।

আগে দেখ। কিছু হবে না। পরের গাড়িতে আসছি ভাই। বাজারটা সেরে আসি।

কি নোংরা করে রেখেছ দেখছিস?

আগে শেয়ালদা ছিল সব চেয়ে তকে তকে, এখনও হয়েছে সবচেয়ে নোংরা। পা দিলেই গা ঘিন্ ঘিন্ করে।

আরে তখন লাটসাহেব শেয়ালদা হয়ে যেত দার্জিলিং। ইংরেজের শাসন ব্যবস্থাই ছিল আলাদা। এখন খইনি ডলতে ডলতে তেলোর ছাল উঠে যায়। শাসন যন্ত্র চালাবার সময় কোথায়।

তা বটে। ইংরেজও গেছে ডিসিপ্লিনও গেছে।

আর বলিস না। জুন মাসের সাত তারিখে বর্দ্ধমানে চিঠি দিয়েছিলাম সেটা পৌঁছেছে আগষ্ট মাসের নয় তারিখে। কি কাজের বহর বুঝতে তো পারছিস।

আরে এতো অল্পেই শেষ। টাকা পাঠালাম বাড়িওলার নামে মনি-অর্ডার করে। পোষ্টাপিস থেকে বাড়িওলার ঠিকানা দুশো গজের মধ্যে। টাকা পৌঁছাল এগার দিন পরে।

আর কলকাতায় থেকে লাভ নেই। কোথাও কোন শৃঙ্খলা নেই ভাই। এবার চল বেরিয়ে পড়ি।

নগাদা বলত, পেটের দায়ে যারা চাকরি করে তাদের সংখ্যা কত বলতে পারিস ?—

বললাম, সবই।

তাহলে চাকরিকে চাকরি মনে করাই উচিত।

আমরা তো তাই মনে করি।

যতদিন চাকরি পায়না ততদিন চাকরি চাকরি ডাক ছাড়ে। পেয়ে গেলেই পাথরে পাঁচ কিল। চেয়ারে বসলেই মেজাজ বদলে যায়। দু দিনের কাজ দু মাসে করে। দু মাসের কাজ দু বছরেও শেষ হয় না। এ যেন থ্রু ট্রেনের যাত্রী। গাড়িতে উঠে নিজের জায়গাটুকু করে নিয়ে বসবার পর অপর স্টেশনে গাড়ি থামলেই দরজা বন্ধ করে রাখে। জায়গা নেই মশাই।

মশাই কোন রকমে উঠলেন। তিনি উঠেই পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই চিৎকার করেন, জায়গা নেই মশাই। যতক্ষণ উঠতে পায়না ততক্ষণ কাকুতি মিনতি। উঠলেই চেহারা বদলে যায়। চাকরিও এমনি। না পাওয়া অবধি কাকুতি মিনতি। পেলেই লাট সাহেবের মেজাজ। বুঝলি।

বললাম, কিন্তু নগাদা।

আরে কিন্তু ফিন্তু নেই। ও হল চেয়ারের গরম। এ যেন কোলকাতার হাকিম। আদালতে মানুষের যম। রাস্তায় বেরিয়ে আসামী ফরিয়াদির সাথে ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে সাম্যবাদী। চেয়ার, শুধু চেয়ার। চেয়ারের দাম বাড়লেই মেজাজ বাড়ে। আট আনার সাহেব চার আনাকে ধমকায়, চার আনার সায়েব ধমকায় দু আনার সায়েবকে, দু আনার সায়েব ধমকায় এক আনার সায়েবকে, এক আনার সায়েব ধমকায় চাপরাসি আর পিওনকে। বুঝলি !

বসলিনা তো কোন চেয়ারে। বসলে বুঝতি। হুজুর থেকে উজীর তক্ ঐ একই খেলা দেখবি।

আমাদের নিয়ামতকে চিনিস ? নিয়ামত নিয়মিত ভাবে সেলাম দিত। কমাস থেকে দেখছি নিয়ামত সেলাম পাচ্ছে। প্রমোশন পেয়ে হেড পিওন হয়েছে। তার প্রাপ্য আদায় করতে কসুর করছে না। কনেষ্টেবল দারোগা হলে মেজাজ যেমন পাল্টে যায়, নিয়ামতেরও তাই হয়েছে।

সেই নীলবর্ণ শৃগালের কথা জানিস তো ? নীল শৃগাল রাজা হয়ে

স্বজাতিদের সহ্য করতে পারত না, তেমনি হয়েছে নিয়ামতের, সে পিওনদের সহ্য করতে পারছে না।

বিরস ভাবে নগাদা বলা শেষ করে মন্তব্য করল, এমনি হয়।

আলিনগরের খালের ধারে ইনু মিঞা আজও ঘুরছে তার দোকানের ডালা গলায় ঝুলিয়ে। আমিনাবিবি হাসপাতাল থেকে ফিরে আসছে দু বছর পর পর। ইস্কাপনীর দালাল সেকেন্দার আজকাল দেশসেবী হয়ে বগল বাজাচ্ছে। চেষ্টায় আছে সরকারী ছাপে পৌরবাবার দলে নাম লেখাবার।

ইতিহাসের পাতা উল্টাচ্ছে।

পুরানো কথা নতুন করে লেখা হচ্ছে। পরিবর্তন কোথাও হয়ে থাকলেও তা চোখে পড়ে না।

খালের বুকে জঞ্জাল ফেলা হচ্ছে। খাল ভরাট করে নতুন শহর বসবে। শহরের মালিকানা কার রইবে সে কথা আজও ঠিক হয়নি।

আলিনগরের খালের দুপাশে মানুষের মেলা বসে।

সকাল হলেই সাঁকোর দুধারে এতিমদের ভীড় জমে। হাতে টিনের বাক্স নিয়ে গুটি গুটি ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরে।

অ-মা, দুটো ভিক্ষে পাই মা।

গৃহস্থ বাড়ির দরজায় সময়ে সময়ে ভিখিরী মেয়েরা ভীড় জমায়। পুরুষরা ভিক্ষেয় আসে না, চওড়া ফুটপাতে বসে সংসার আগলায়।

জোয়ান মেয়েরা আগে যায়। বুড়িরা যায় সবার পরে। কচিকাচার হাত ধরে তারস্বরে চিৎকার করে। শহর কোলকাতার আসল মানুষ তখনই রাস্তায় দেখা যায়।

নকীবের ডাক আর শোনা যায় না। শোনা যায় ভিখিরীর আর্তনাদ।

দামামার তালে তালে পা ফেলে পিলখানার পিল আর কামান টেনে আনে না। তুরুক এখন রেসের মাঠে।

ভাগীরথীর বুকে শহরের ছায়া পড়ে। জলের দোলায় দুলতে থাকে শহর।

জাহাজের ভোঁ শুনে চমকে উঠে বাবুঘাটের শানের বাসিন্দা ভিখারীর দল। আবার ঝিমোয় ক্লান্তিতে।

বাঁশের ছাউনীর তলা থেকে বাস্তহারা রামমোহনের স্ত্রী শঙ্কিত ভাবে পা ফেলতে ফেলতে এগিয়ে যায় ইডেন উদ্যানে। শিকারী বেড়ালের মত চক্ চক্ করে তার চোখ। পেটের জ্বালা চোখের পাতায় কালিমার ছাপ দিয়েছে, দেহে দিয়েছে রোগের আভাষ।

ফৌজী জোয়ানরা প্রিন্সেপ ঘাটে বসে, কবিতা লেখে কিনা জানা যায়নি। প্রবাসী প্রেয়সীর চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতে থাকতে জাহাজের ভোঁ শুনে হয়তো চমকে ওঠে।

রামরতিয়ার মা নিঃশব্দে পা ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলে ঝুপরীর দিকে। বন্দোবস্তী মানুষকে জুগিয়ে দিয়ে আসে ভোগের পদার্থ।

পানওলার দোকানে ভীড় জমে অনেক রাতে। পান কেনেনা কেউ-ই। নিশাচর মানুষ চকচকে পঁচিশ নয়া পয়সার টুকরো চুপে গুঁজে দেয় পানওলার হাতে। গোপনে ছোট্ট পুরিয়া পৌঁছায় খদ্দেরের হাতে। নতুন খদ্দের দেখলে মাল বেচে না।

সাঁঝের বাতি জ্বললে শহর কোলকাতার নীচের তলার মানুষের ঘরকন্না সুরু হয়। ওপর তলা তখন ঘর ছেড়ে পথে পা দেয় নীচের তলায় মধু সংগ্রহে।

মুন্সীপাড়ার বাসিন্দারা ঠোঁটে রঙ্ দিয়ে সারি বেঁধে দরজায় দাঁড়ায়। পুরাতন শহরের ঐতিহ্য ওরাই বুঝি বাঁচিয়ে রাখে।

বুলবুলির লড়াই আর নেই।

বাইজির নাচ নেই।

এখন লড়াই হয় গোপন রণক্ষেত্রে।

বাইজির নাচ হয় স্টেজে। রাতের ক্লাবে মহামহা মানুষের দল ককটেলে নাচে, সাথে নাচে ভাড়াটিয়া বিবি।

সেই শহর আজও আছে, সেই রুচি আজও আছে, শুধু ভোল বদলেছে। নতুনের পলেস্তারা দিয়ে ভদ্র সভ্য হয়েছে ওরা।

নগাদা বলল, এবার চাকরিটা ছাড়বই ছাড়ব।

জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ সন্ন্যাস কেন?

সন্ন্যাস নয়, জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে। কয়েদখানা এর চেয়েও ভাল।

প্রভুর পদলেহন করতে করতে জিবের ছাল উঠে গেছে। আর প্রভু সেবা সম্ভব নয়। তাই ভাবছি।

অর্থাৎ ?

সে কথা নাইবা শুনলি। যদি চাকরি করতি কোন দিন, তা হলে বুঝতি ? এর চেয়ে, থাকগে।

সোজা পথ ধরল নগাদা।

এবারও চাকরি ছাড়া হয়নি।

বললাম। অর্থাৎ স্মরণ করিয়ে দিলাম।

বলল, বুঝিস না কিছুই। ব্যারাকপুরে যেদিন মঙ্গলপাঁড়ে সায়েব মারল, সেদিন আতঙ্কে সায়েব বিবিরা জাহাজে উঠে বসল। যখন বুঝল, বিপদ খুব দূরে তখন আবার এসে বলনাচের আসর জমাল। আমারও তাই। যখনই মনে হয়, বিপদ এসে গেছে তখনই বৈরাগ্য জাগে। এখন বিপদ অনেক দূরে তাই বলনাচ নাচছি।

নাচার বিরাম আর নেই।

শূন্য উদর সন্তান নাচছে বস্তির ঘরে।

পূর্ণ উদর সন্তান নাচছে দোমহলায়।

দীর্ণ হৃদয় প্রেমিক নাচছে প্রেমিকার দ্বারে।

জীর্ণ বসন ভিখারী নাচছে ধনীর দুয়ারে।

শুধু নাচ। নাচের আর শেষ নেই। নাচের ভঙ্গীতে কোলকাতার সকাল হয়, নাচের ভঙ্গীতে কোলকাতার রাত হয়। মেয়ে নাচে, মরদ নাচে ; নাচায় হুজুরগণ।

নাচ সুরু হয়েছিল আড়াইশ বছর আগে।

নাচের ভঙ্গী বদলেছে, কিন্তু নাচ বন্ধ হয়নি।

নগাদা বলল, তোদের মত গণ্ডায় গণ্ডায় স্টুপিড যদি থাকত সারাদেশে তাহলে নতুন নাচের ট্রেনিং দিতে পারতাম।। সে নাচ টাকার নাচ। টাকা নাচে ও নাচায়। সেই ছন্দোবদ্ধ নাচ যদি শিখতে চাস, তাহলে যাস আমাদের বসুবাবুর বাগান বাড়িতে। বুঝলি!

যুগের হাওয়া বুঝলি! ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখ, দেখবি উত্তুরে হাওয়া সেদিন বয়েছে আজও বইছে, কন্‌কনানি মোটেই কমেনি। লোকের পকেটে

যখন পয়সা বেশি থাকে তখন বুলবুলির নাচ শুরু হয় ঘরে ও বাইরে। যখন পয়সার কমতি পড়ে তখন দেবস্থানে ভীড় বৃদ্ধি পায়। নেহাত কিছু যাদের কপালে জোটে না তারা বসে পড়ে ফুটপাতের গণক ঠাকুরদের সামনে। দেবস্থান থেকে ফুটপাত, ফুটপাত থেকে চৌরঙ্গীর হোটেল, সর্বত্রই নানা ঢঙের নাচ। এ নাচের আর শেষ নেই।

জানিস ভাই, সংসারে সবচেয়ে বেশি যারা বঞ্চিত তারা অভিযোগ করে কম। বঞ্চনায় যারা অভ্যস্ত তারা জীবনে কখনও মাথা উঁচু করে না, যা প্রাপ্য তাও চায় না। তাই ছোটে ভাগ্যের তাড়ণায়। পুরুষাকার ওদের মৃত।

নগাদা দার্শনিকের মত মন্তব্য করে ফিরে গেল।

বসে বসে ভাবছিলাম।

শ্যামবাজার থেকে যাদবপুর, টালা থেকে টালিগঞ্জ। একদিনে তো এত বড় শহর গড়ে ওঠেনি। বছরের পর বছর ক্লেদ জমে, জীবনবন্যায় পলি-মাটিতে ঘাস জন্মায়। সবুজ ঘাস রোদের তাতে শুষ্ক রসহীন হয়ে মিলিয়ে যায়।

আলিনগরের খালের ধারে রুজিরুটির দায়ে সারাদুনিয়ার মানুষ এসে জমায়েত হয়েছে।

যাদের মালিকানা ছিল, তাদের পাথরখোদা মূর্তি শহরের পথে নিশ্চল পাহারা দিচ্ছে। গৌরব বাড়ছে কি কমছে, কে জানে।

হুজুররা আজও তাদের সেলাম দেয়, সাক্ষাতে অথবা অসাক্ষাতে। হুজুরদের লজ্জা একটু কম।

হুজুরের দল আজও যাদের বুকে পা দিয়ে চলেন তারাই বোধহয় হুজুরদের চলবার পথ তৈরী করে দিয়েছিল নিজেদের সব কিছু বিলিয়ে।

তাই মানুষের মন থেকে নীতির প্রশ্ন উপে গেছে। প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রার্থিত দ্রব্যের পরিমাণ কমেছে, তাই পরস্পর পরস্পরকে ঠকিয়ে পকেট ভারি করছে।

আলিনগরের খালে আজও খড় বোঝাই নৌকা আসছে।

আলিনগরের আলির কথা লোকে ভুলে গেছে।
আজকের মানুষ ভোলেনি শুধু দুইটি জন্মগত বৃত্তি, বাঁচো আর সৃষ্টি কর।
নবাবী গেছে।
ইংরেজের জমিদারী গেছে।
আলিনগরের খালের ধারে শহর তবুও দাঁড়িয়ে রয়েছে।
রইবে।
আরও অনেককাল রইবে।
যারা আছে তারাও যাবে।
রইবে শুধু শহর।

নগাদা মাঝে মাঝে বলত, কোলকাতা শহরটা এখনও বেঁচে আছে কেন জানিস ?

প্রথম দিন তার কথা বুঝতে না পেরে বলেছিলাম কোলকাতায় কর্পোরেশন আছে বলেই কোলকাতা শহরটা বেঁচে আছে।

নগাদা চটে উঠেছিল, বলেছিল, জানিসতো কচু। শহর কোলকাতা বেঁচে আছে শুধু মোবাইল হোটেলের কৃপায়।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে আবার কি ?

চোখ থাকলে দেখতে পেতিস। দেখিস না, ফুটপাতের কোনায় পেতলের গণ্ডা খানেক থালা নিয়ে বসে থাকে এক একজন লোক, সামনে থাকে ধামা বোঝাই পীতাভ চূর্ণ, যাকে তোরা বলিস ছাতু। হোটেলের প্যাসেনজার কম নয়। প্যাসেনজাররা পয়সা দিয়ে পীতাভ চূর্ণ ক্রয় করলে বিনামূল্যে একটু নিমক আর একটা মিরচাই ফাউ পায় আর পায় পেতলের থালা আর লোটা ভর্তি জল। অবশ্য, দক্ষিণা অগ্রিম দেয়।

মোবাইল হোটেল কোলকাতার এ কোনায়, সে কোনায়। ক্রেতা বিক্রেতার কারুরই কোন আস্তানা নেই। আস্তানা গড়বার মত সামর্থ্যও সৃষ্টি হয় না কোনদিনই। এরাই তো কোলকাতার আসল বাসিন্দা। এরা আসে

ভাসতে ভাসতে যায়ও ভাসতে ভাসতে। জন্মদাতা আহার্য দিতে পারে না, জন্মস্থান মাথা গুঁজবার স্থান দিতে পারে না। তাই শুধু মাত্র বাঁচার নেশায় মোবাইল হোটেলের খাতায় নাম লিখিয়ে শহরটাকে জীবন্ত প্রমাণ করে নিজেরা মরণের প্রতীক্ষায় ধুঁকতে থাকে।

শহর কোলকাতার বাতাসে ওদের মরণ শীতল নিশ্বাস হাহাকার তুলতে ভয় পায়। নগর কোতোয়ালের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অন্তরালে বসে এরাও সংসার পাতে ফুটপাতে। সেখানে বাড়িওলার হুমকি নেই, ট্যাক্সের বালাই নেই, গৃহ মেরামতের দায়িত্ব নেই। নির্ব্বিকার ভোলানাথ ওরা।

তাই বুঝি শহর বেঁচে আছে আজও।

শহর বেঁচে থাকবে আরও কিছু কাল, কিন্তু যারা চিরকালের বাসিন্দা তাদের রয়েছে ফুটপাত। যারা সংগ্রহ করে সামান্য মাথা গুঁজবার মত আশ্রয়, তারাও আনন্দ পায় মৃত্যু বিড়ম্বিত জীবনের দুঃস্বপ্ন থেকে নিজেকে আড়াল করে। এই দলের মানুষ উঁচুতে নজর রাখে, নীচুর দলে পা ফেলতে থমকে যায়।

রামভজন বলত, যব্ হামি কলকত্তা আইলন, উস্ টেইম মে নোকরি-উকরি মিলৃলন না হাজুর।

রামভজনের উক্তি বড়ই স্পষ্ট। লোটা কম্বল সম্বল করেই আরও দশজনের মত সেও এসে দাঁড়িয়ে ছিল হাওড়া স্টেশনের ছাউনির তলায়। দুদিন চারদিন কাজকর্মের খোঁজ করেও সাফল্যের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। দেশোয়ালি ভেইয়াদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারল, দেশে যারা কাকা-জ্যাঠা-বন্ধু-স্বজন, তারা শহর কোলকাতায় বড়ই দূরের জন অথবা দুর্জন। অবশ্য একটি দ্রব্য বড়ই সহজ লভ্য, সেটা হল বিনামূল্যের উপদেশ।

গুরুবচন পথটা দেখিয়ে দিল বিনামূল্যের উপদেশের মাধ্যমে। একটু ফাউ পেল রামভজন। ফাউ দিয়েই রামভজন জীবন গড়ে তুলল।

গুরুবচনের উপদেশ মত রামভজন ঝোড়া মাথায় নিয়ে এসে দাঁড়াল বড়বাজারের ফুটপাতে। বাবু-মহাশয়দের মাল বয়ে বয়ে বেড়াতে লাগল, জুটল আহার্য। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে বোঝাই ঝোড়া নিয়ে স্লিপ-কাটল রামভজন। গুরুবচনের উপদেশ মতই হাতে হাতে ফল পেল। মাস না পেরোতেই রামভজনকে দেখা গেল দখিন পাড়ায় তার দেশোয়ালি

ভাইদের আস্তানার আশেপাশের ফুটপাতে। 'এক্ দরজন্ থারিয়া আর এক্ তোকৃরি ছাতুয়া' এই নিয়ে শুভ উদ্বোধন হল তার মোবাইল হোটেলের।

কোলকাতায় এসে সে বুঝতে পেরেছিল মোবাইল হোটেলের প্রয়োজনীয়তা। গুরুবচনের উপদেশ তার ভাগ্যের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিল মাত্র। একদিন সে নিজেও এই হোটেলের প্যাসেনজার রূপেই আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল, সে জানত তারই মত ভাগ্যান্বেষীরা আসবে এই শহরে, তাদের আত্মরক্ষার যখন পথ থাকবে না, তখন তারা বাঁচবে শুধু মোবাইল হোটেলের দয়ায়।

নগাদা বলেছিল মন্দ নয়। শহর কোলকাতা বেঁচে আছে মোবাইল হোটেলের দয়ায়।

আরও বলেছিল নগাদা। বলেছিল, টাকা উড়ে বেড়ায় এই শহরে। শিকারী ভাল হলে টাকা কুড়িয়ে নিতে কষ্ট পায় না। শহর কোলকাতায় নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে নিত্য। সেই সব প্রতিষ্ঠানের ভাল-মন্দ মানুষের দল ওঁত পেতে বসে থাকে। সুযোগ বুঝেই জাল গুটিয়ে নেয়। উপার্জ্জন যেমন সহজ, ব্যয়ও তেমনি স্বল্প।

আগে দরখাস্ত করুন। দরখাস্ত মানেই ফি। তারপর ইণ্টারভিউ। ইণ্টারভিউ মানেই নগদ টাকা জমা দিয়ে চাকরি। চাকরি মানেই পকেট খালি করে পরের দিন ফুটপাত আশ্রয়।

ব্যবসায়ীর দল কচিৎ কখনও কোতয়ালদের নজরে পড়ে, কচিৎ কখনও ব্যবসা গুটাতে বাধ্য হয়। তখন হয় পাড়া বদল।

মানুষের জীবনে অথবা জাতির জীবনে যখন আসে অর্থনৈতিক দুর্যোগ, তখন নিপীড়িত মানুষ খুঁজতে থাকে আশু উপার্জনের পথ। পথ তারা চেনে না, জানে না। পথদ্রষ্টাকে খুঁজতে থাকে।

নগাদা বলে তাই তো দেখতে পাস ফুটপাত জুড়ে বসে রয়েছে জ্যোতিষ-বিজ্ঞানীর দল।

চাকরি টাকরি হবে পণ্ডিতমশায় ?

এই হল স্বাভাবিক প্রশ্ন।

হাতের তেলোতে অতসী কাঁচ লাগিয়ে অনেক্ষণ নিরীক্ষণ করে উত্তর দেয়,

তোমার বৃহস্পতির স্থানটা তো ভাল মনে হচ্ছে না। শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা দরকার। অথবা, আর দুটো মাস মাত্র।

খুশী মনে কেউ ফিরে আসে দক্ষিণা দিয়ে, কেউ খুশী হতে পারে না।

এতেও যাদের আত্মতুষ্টি হয় না, তারা খোঁজ করে স্বামীজি মাতাজিদের। গুরুর চরণ সেবা করে অথবা ধারণ করে ভবনদী পেরোতে চায় তারা। আসলে এদের পকেট শূণ্য থাকে না, শূণ্য থাকে মন। মনকে ভর্তি করতে ব্যয় করে গুরজি-মাতাজির সেবায়। অঙ্ক বৃদ্ধির হিসাব খোঁজা এদের কাজ।

ব্যস্ততাময় শহরে অর্থচক্রের চারধারে মানুষ ঘুরতে থাকে ওমনি ভাবে। জীবনে তাদের ভাটার টান রয়েছে, জোয়ারের ঢেউ সহজে আসে না। উদ্গত অশ্রু রুদ্ধ করে আশায় বুক বেঁধে নতুন দিনের প্রতীক্ষা করা এদের ধর্ম।

খালের জলে এখনও জোয়ার ভাটা খেলে, সেই জলে ধুয়ে যায় মানুষের কান্না। তাই কান্নার শব্দ কানে পৌঁছায় না। তাও আর কদিন! খাল ভরাট হলে মানুষের ক্রন্দন ধ্বনি বিষিয়ে তুলবে সারা শহরের অলি-গলি-সন্ধি। সেদিন বুঝি আর দুরে নেই।

দিল্লি থেকে পালমের দূরত্ব কতটা? দশ মাইল!

বাদশাহ শাহ আলম!

আজকের বাদশাহী দেখে চমকে উঠনা। দূরত্ব ধীরে ধীরে কমবে। সময় দরকার। তাড়াতাড়ি হয় কি! ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে। সময় এগোচ্ছে।

শহর কোলকাতার জীবনে নতুনত্ব কিছু নেই। ইট-কাঠ-লোহার আয়তন ও পরিমাপই শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে উপর তলার জমার অঙ্ক। নীচের তলায় আগের মতই সবার অলক্ষে সুরঙ্গ পথে নীতিহীন জীবন এগিয়ে চলেছে। আমরা শুধু অসহায় দর্শক।

এই শহরের কঠিন কাঠ-পাথরের তলায় ডুকরে ওঠে অসহায় মানুষের কান্না। কখনও কখনও কান্নার আওয়াজে তরঙ্গ ওঠে শহরে মানুষের মনে। সে তরঙ্গে সাগরের উন্মত্ততা থাকেনা; বদ্ধ জলাশয়ের ক্ষীণ সেই তরঙ্গ অদৃশ্য

হয় গণমানসের অবচেতন মনের কোনায়। কবরের নিস্তব্ধতা ভেঙে পড়ে কর্ম-চাঞ্চল্যের অন্তরালে। বেভুল মানুষ ভুলেই শান্তি পায়, সান্ত্বনা পায়, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

এ কান্না থামবার নয়।

পূব থেকে এসেছে মানুষের দল। অশ্রুসজল আঁখিযুগল। সেই জলে বুক ভিজেছে নিজের, বুক ভেজেনি তাদের যারা যান্ত্রিক সেজে যন্ত্রের মত পেষণ-চক্র চালিয়ে নিয়ে চলেছে ঐ বুকভেজা মানুষের বুকের উপর দিয়ে।

এসেছে আজ বিদায়ের পালা।

কে রইবে আর কে রইবেনা, তার খতিয়ান নিয়ে দ্বার পাহারা দিচ্ছে হুজুরের দল।

নগাদা বলত, ভয় পাস্‌নে যেন। শহর কলকাতার পাহারাদার রয়েছে দুই দলে বিভক্ত হয়ে। একদল হুজুর, আর একদল ষণ্ড। ষণ্ড নিরীহ পারাবাত নয়, তাই নিরীহ মানুষকে গুঁতিয়ে অনেক কিছুই করে লণ্ডভণ্ড। আর হুজুররাও গুঁতোয়, লণ্ডভণ্ড করে। ভণ্ডামি তাদের তন্ত্র।

তবুও ছেদ নাই, শহুরে জীবনের গতিতে। বিজলী আলোর চকমকি, সিনেমায় লাইন দেবার অফুরন্ত ধৈর্য্য, ট্রাম বাসের ঘরঘরাণি, সব মিলিয়ে জান্তব জীবনের পরিচয় নিয়ে চল্‌ছে বেহায়া মানুষের দল। মানুষ হয়ে উঠছে বন্য পশুর মত হিংস্র। হিংসার পাবকে পুড়ে খাক্ হচ্ছে মানুষের অন্তর দেবতা।

নগাদা বলত, তোরা বড় ভাব-প্রবণ। এই মানুষ জাতটা যখন বৃদ্ধি পায়, তখন শুধু গায়ে গতরেই বৃদ্ধি পায় না, বৃদ্ধির পথে যারা বিঘ্ন, তাদের মাথায় পা দিয়েই তারা বৃদ্ধি পায়।

তুই দেখ্‌না, এই ঝুনঝুনি আর টুনটুনি কেমন বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতির জনক ফতোয়া দিল বিদেশী বর্জন কর। ফতোয়ার তালে তালে নেচে উঠল মোদের বঙ্গদেশ। সুযোগ বুঝে ঝুনঝুনিরা বসল কলকারখানা নিয়ে। আর মোদের বঙ্গদেশে রইল শুধু টি, বি, আর খাবি। ম্যালেরিয়ার মত পাইকিরি হারে ঘরে ঘরে টি, বি, , পটল তোলার রির্হাসেল শুনছে ভবি ; আর বাকী যারা আধপেটা তারা, খাচ্ছে শুধু খাবি। তারপর 'সজল নয়ন-যুগলে ঝরে বারি ধারা'। তার চেয়ে 'লহ নগর, ফিরে দাও অরণ্য মোর'।

আলিনগরের খাল !

সজল আঁখির জলে হয়েছে চঞ্চল।

এ খাল বুঁজিয়ে দেবে। নির্গমনের পথ না পেয়ে মানুষের ব্যাথাহত অশ্রু উপচে উঠবে একদিন, সেদিন নূতন ক'রে লেখা হবে এই শহরের ইতিহাস।

সভ্যতার অহিফেনে ঝিমিয়ে পড়েছে সারা তুনিয়ার মানবতা-বোধ। বঞ্চনা হয়েছে সম্বল, তঞ্চকতা হয়েছে জীবিকা, গুম্‌রে মরছে সভ্যতা বিলাসী মানুষের মন; সভ্যতাদর্পী এই শহরে মানুষের ওষ্ঠে ফুটে ওঠে হাসির আরক ভেজা ক্রন্দনের গোপন রূপ। যে শহরের বনিয়াদ পত্তন হয়েছিল লুঠেরার হাতে, কাঠামো গড়ে উঠেছিল জালিয়াতির ঘৃণ্য নিঃশ্বাসে, তার মুমূর্ষু আত্মা লোক-চক্ষুর অন্তরালে বসে ধিক্কার দিচ্ছে মিথ্যাচারী শোষক হুজুরদের। যার বনিয়াদ গড়ে উঠেছে অন্যায়ের তীব্র হলাহলে, নীলকণ্ঠের অভাবে সেই হলাহল বিষিয়ে তুলেছে এই শহরের মানুষের দলকে।

আলিনগরের আলি, আলির তুলাল সিরাজ—সবাই যেন অলক্ষ্যে বসে হাসছে মীরজাফরের উত্তরপুরুষদের বুকফাটা কান্নার আওয়াজ শুনে।

একটু ধীরে। একটু ধীরে পা বাড়িয়ো এই শহরে !
